শুকতারা

মৃত্যুদূতের কালোছায়া

ঊনচত্বারিংশৎ বর্ষ
দ্বাদশ সংখ্যা
মাঘ • ১৩৯৩

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ সুজিৎ কুণ্ডু

স্ক্যান ঃ শুভঙ্কর ঘোড়ুই

এডিট ঃ হরিদাস পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

নতুন উন্নত ফ্যারেক্স®

আপনার শিশুকে শক্ত-আহার ধরানোর জন্যে আদর্শ!
কারণ,এতে শিশু-বিকাশের উপযোগী উপাদান আছে।

প্রোটিন ও ফ্যাটের সঠিক মিশ্রণ

প্রোটিনে ভরপুর ফ্যারেক্স শিশুকে সুস্থসবলভাবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করে। নতুন উন্নত ফ্যারেক্স শিশুর কোমল হজম-শক্তির উপযোগী করে বিশেষভাবে তৈরী। এতে সঠিক পরিমাণে ফ্যাট মেশানো আছে।

সুস্থ রক্তের জন্যে যথেষ্ট আয়রন

সাধারণতঃ শিশুর শরীরে জমা আয়রন চতুর্থ মাসে কমে আসে। ফ্যারেক্স-এ যথেষ্ট পরিমাণে আয়রন আছে, যা শিশুর রক্ত সুস্থ রাখতে আর রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

ক্যালসিয়াম-ফসফরাসের আদর্শ অনুপাত

শিশুর দাঁত আর হাড় সুস্থভাবে গড়ে তোলার জন্যে ক্যালসিয়াম আর ফসফরাসের বিশেষ প্রয়োজন। এই জন্যেই ফ্যারেক্স-এ ক্যালসিয়াম-ফসফরাসের ২ঃ১ আদর্শ অনুপাত রাখা হয়েছে।

ফ্যারেক্স-এর প্রত্যেক আহার এখন অনেক বেশী সুস্বাদু। মেশানো আরও অনেক সহজ।

দুধ মেশানোর প্রয়োজন নেই!
শুধু জল মেশান আর খাওয়ান।

নতুন উন্নত ফ্যারেক্স®

CLARION/B/GX/15/244/BEN

বাঁটুল দি গ্রেট

বাঁটলো আসছে, দোস্ত দড়িটা নিয়ে তৈরি আছিস তো?
নিশ্চয়, আমি তৈরি!
খাওয়ার পর পণ্ডিত স্যার তাঁর দিবানিদ্রা দিচ্ছেন। আমি দড়ি বাঁধা এই হুক টুক করে ওর চেয়ারে আটকে দি। খিঁক খিঁক!
আমরা স্কুলের খেলাধূলার জন্যে টাগ-অব-ওয়ার প্র্যাকটিস করছি, বাঁটুলদা! তুমি কি দড়ির ঐ দিকটা ধরে টানবে?
নিশ্চয়!
আরিব্বাস! যা ভেবেছি তার চেয়ে তোদের বেশী জোর!
কেটে পড় দোস্ত!
ইর্‌র্‌ক!
এটা কি ব্যাপার হলো?
আমি প্রতারিত হয়েছি!
হাঃ হাঃ! দুপুরের পরে আর স্কুল নেই! পণ্ডিতস্যার নদীতে ঝাঁপাতে যাচ্ছেন।
ঝপাস!

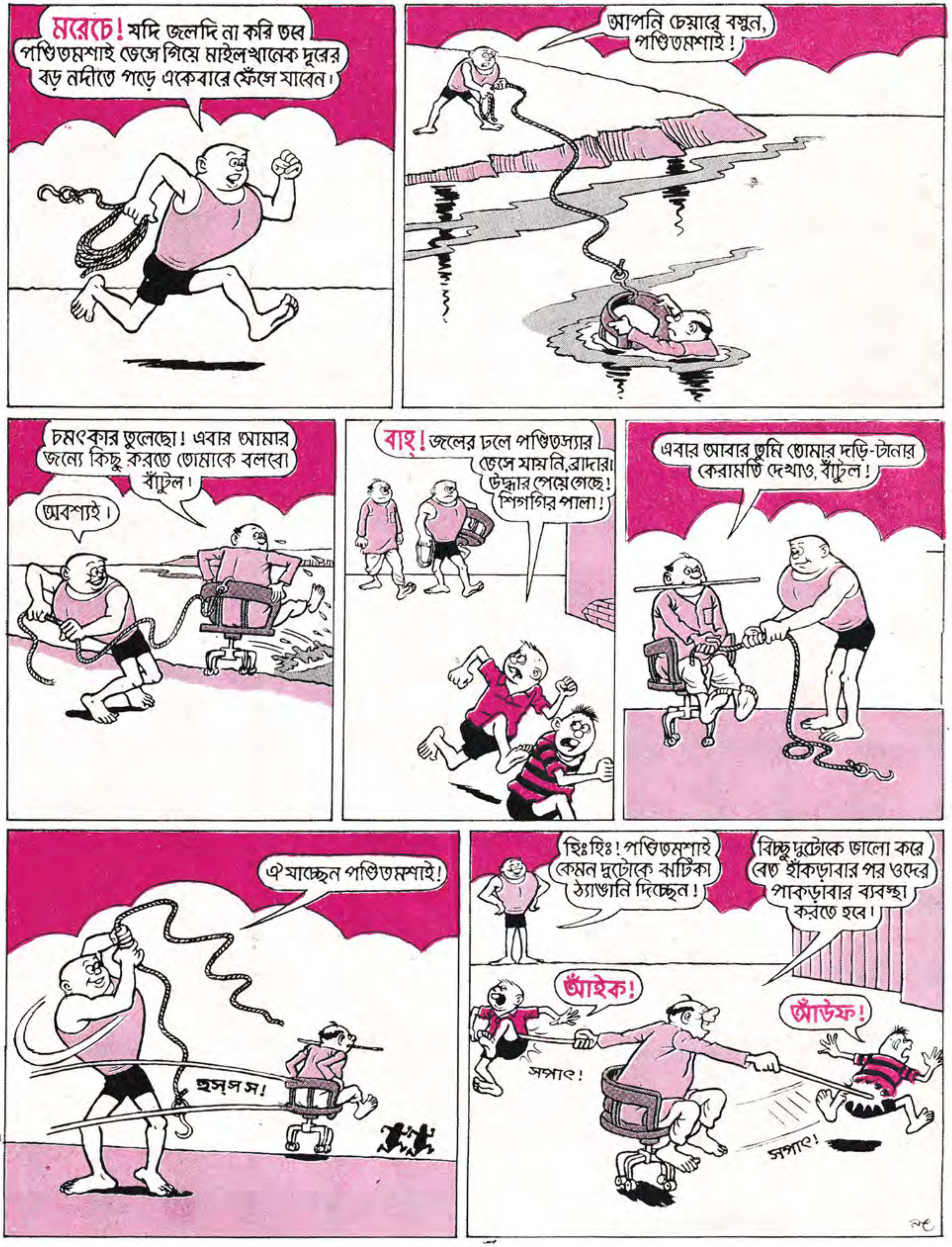
মরেচে! যদি জলদি না করি তবে পণ্ডিতমশাই ভেসে গিয়ে মাইলখানেক দূরের বড় নদীতে পড়ে একেবারে ফেঁসে যাবেন।
আপনি চেয়ারে বসুন, পণ্ডিতমশাই!
চমৎকার তুলেছো! এবার আমার জন্যে কিছু করতে তোমাকে বলবো বাঁটুল।
অবশ্যই।
বাহ্! জলের ঢলে পণ্ডিতস্যার ভেসে যায় নি, ব্রাদার! উদ্ধার পেয়ে গেছে! শিগগির পালা!
এবার আবার তুমি তোমার দড়ি-টানার কেরামতি দেখাও, বাঁটুল!
ঐ যাচ্ছেন পণ্ডিতমশাই!
হুস্‌স স!
হিঃ হিঃ! পণ্ডিতমশাই কেমন দুটোকে ঝটিকা ঠ্যাঙানি দিচ্ছেন!
বিচ্ছু দুটোকে ভালো করে বেত হাঁকড়াবার পর ওদের পাকড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে।
আঁইক!
সপাৎ!
আঁউফ!
সপাৎ!

বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত ছোটদের মাসিক পত্রিকা

শুকতারা

মাঘ ১৩৯৩

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION. WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 538 (17) 1 (9) T.B.C. (dated 21.7.86)

সূচীপত্র

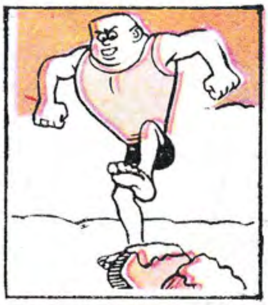

১। মৃত্যুদূতের কালোছায়া (ছবিতে গল্প) —নারায়ণ দেবনাথ প্রচ্ছদ
২। বাঁটুল দি গ্রেট (ছবিতে গল্প)—নারায়ণ দেবনাথ ২৪১
৩। কাকু আমার (কবিতা)—জয়নাল আবেদীন ২৪৫
৪। বৃশ্চিকের পদক্ষেপ (গোয়েন্দা গল্প রঙিন ছবিতে)—ইন্দ্রনীল ঘোষ ২৪৬
৫। লেফটেনান্ট নাসির আহমদ —(অগ্নিযুগের সৈনিক) —সুধীন্দ্রনাথ রাহা ২৪৮
৬। অবাক কান্ড ২৫১
৭। মত্ত মাতঙ্গ (শিকারের গল্প) —শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫২
৮। আই. ওর হাতছানি (কল্প-বিজ্ঞানের গল্প) —অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায় ২৫৭
৯। আস্ত বোকা (রূপকথা)—শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায় ২৬২
১০। কেষ্ট বিষ্টু এবং তোতাপাখি (হাসির গল্প) —জীবন ভৌমিক ২৬৫
১১। ছবির মজা—অমল ২৬৭
১২। স্টার ট্রেক (ছবিতে কল্প-বিজ্ঞানের গল্প) ২৬৮
১৩। যাদুর দেশে টারজান (অ্যাডভেঞ্চার)—সব্যসাচী ২৭০
১৪। খেলাধূলা—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭৫
১৫। ব্রুস লি (ছবিতে গল্প)—ডিভোনো ও ম্যাটেরা ২৮৬
১৬। অলৌকিক (সত্য ঘটনা) —নন্দলাল ভট্টাচার্য ২৮৮
১৭। এনাটমি কিভাবে এলো (আবিষ্কারের গল্প) —জহর মুখোপাধ্যায় ২৯১
১৮। জাতিস্মর (গল্প) —অনিমা মুখোপাধ্যায় ২৯৫
১৯। হাতে কলমে—গঙ্গেশ ঘোষ, মদন মুখোপাধ্যায় ২৯৭
২০। অঙ্ক জগতের জাদু (ম্যাজিক) —জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়ার) ২৯৮
২১। রূপোর নদী (ধারাবাহিক উপন্যাস) —অনিল ভৌমিক ৩০০
২২। একতাই বল (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প) —কবিতা চৌধুরী ৩০৫
২৩। শোধ (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প) —সুব্রত মজুমদার ৩০৬
২৪। কমলা মন্ডল স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা (ঘোষণা) ৩০৭
২৫। হাঁদা-ভোঁদা (ছবিতে গল্প) —নারায়ণ দেবনাথ ৩০৮
২৬। মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ৩১০
২৭। ছবির মজা—মানব বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১৩
২৮। আফ্রিকার জঙ্গলে (ভ্রমণ-কাহিনী) —অমিয়কুমার হাটি ৩১৪
২৯। দাদুমণির চিঠি ৩১৭
৩০। তোমাদের পাতা ৩১৮
৩১। মাসের নাম ফেব্রুয়ারি (ফিচার)—আরতি বসু ৩২০

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য—হাতে নিলে ৫৩ টাকা। ডাকে নিলে ৬৫ টাকা। প্রতি সংখ্যা—টাঃ ৩.৫০

মিষ্টি-মধুর নতুনত্বের আনন্দের মজা চাখুন!
বন বন
এনেছে নিউট্রিন!
স্বাদেভরা, ক্রীমেভরা, ফ্রুটির আনন্দে,
ভাসুন, মুখরোচক্ চারটি স্বাদগন্ধে।
BON BON
nutrine BON BON
দারুণ ভাল নতুন বন্ বন্
এনেছে নিউট্রিন,
নি:সন্দেহে!
মিল্ক ক্রিম • চকোমিন্ট
লিমন কোকোনাট • ফ্রুটি
nutrine BON BON
নিউট্রিন
বন্ বন্
nutrine নিউট্রিন ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর সুইট
নিউট্রিন কন্‌ফেকশনারী কোং প্রাঃ লিঃ, চিত্তুর (অঃ প্র)
CLARION NC 8571

৩৯শ বর্ষ ● ১২শ সংখ্যা ● মাঘ, ১৩৯৩/জানুয়ারি ১৯৮৭

কাকু আমার

জয়নাল আবেদীন

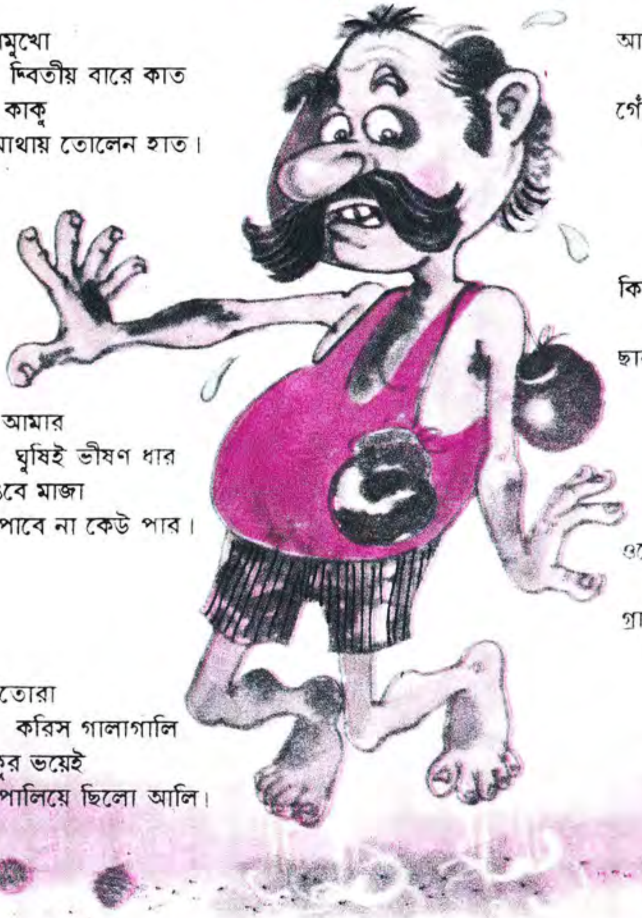

প্রথম ঘুষিই আকাশমুখো
দ্বিতীয় বারে কাত
শেষ ঘুষিটা মেরেই কাকু
মাথায় তোলেন হাত।

আসছে এবার নিজের বাড়ি
সবার সেরা বীর
গোঁফ জোড়াটা দেখলে পরেই
চক্ষু হবে স্থির।

কিন্তু বলি কাকুর আমার
আছে একটা দোষ
ছারপোকাদের দেখলে পরে
করে ভীষণ রোষ।

সবাই জানে কাকুর আমার
ঘুষিই ভীষণ ধার
লড়তে গেলেই ভাঙবে মাজা
পাবে না কেউ পার।

ওদের ভয়েই কাকু আমার
দুদিন থেকে পালায়
গ্রামখানাও হয় না দেখা
ছারপোকাদের জ্বালায়।

মিথ্যে বলে মিছেই তোরা
করিস গালাগালি
জানিস না তো কাকুর ভয়েই
পালিয়ে ছিলো আলি।

ছবি: দিলীপ দাস

উঃ আর একটু হলেই একজনকে চাপা দিয়ে ফেলেছিলাম আর-কি ! হুম্‌ম্‌ । এতো সেই জায়গা। সামনে একটা জটলা পুলিশের লোকজন । সন্ধ্যা হয়ে এসেছে এখন বরং স্বরূপ ধারণ করা যাক ।
কি ব্যাপার কমিশনার, কিছু ঘটেছে নাকি ?
কে ? ও বৃশ্চিক ?
আর বোলনা, উত্যক্ত হয়ে পড়েছি । এ-সবই দু-মুখোর কাজ ।
পুলিশ কমিশনার বৃশ্চিকের কর্মকুশলতায় বৃশ্চিককে চেনেন ও পছন্দও করেন ।
রিপোর্টার প্রসূনকে কিন্তু চেনেন না ।
কিন্তু লোকটাকে মেরেছে আশ্চর্য ভাবে । শ্বাসরোধী কোন যন্ত্রের সাহায্যে এদিকে পিচের রাস্তা এক অদ্ভুত ধরনের বিরাট বিরাট পায়ের চাপে বসে গেছে কি ব্যাপার, কিছুই বুঝছিনা ।
চিন্তা করবেন না, যদি অনুমতি করেন তো আমি একবার ···
তুমি আমার মনের কথাটাই বলেছো, তবে এবারেও মনে রেখো, আইনকে হাতে নেওয়াটা কিন্তু ·····
এটা আমাকে মনে করাতে হবেনা কমিশনার ।
একটু পরে-
কার কাছে গেলে সঠিক খবর পাওয়া যাবে ? হুম্‌ম্‌ ! শহরের দক্ষিণে স্মাগলারদের একটা আস্তানা আছে প্রথমে ওখানেই যেতে হবে ।

পরে—
এই সেই জায়গা ঐতো চেনা একজন চলেছে।
এই যে, এদিকে
ক্-কে কে ?!
দু-মুখো শংকরকে চেন ?
না-না, ক্-কে বললো চিনি ?
পাঁয়তারা ভেজনা বিল্লু.
আমার দাঁড়াটাকে মনে আছে তো ?
সোজা কথায় বল, ওকে চেন ?
সত্যি বলছি স্যার, আমি চিনিনা। তবে কালু হয়তো চিনলেও চিনতে পারে।
কালুর ঠিকানা নিয়েই বৃশ্চিক রওয়ানা হল
বাপ্ রে।
কে ?!
একটু পরে
তোমার নাম কালু ?
কে তুমি জবাব দাও নয়তো গুলি করব !

[চলবে]

লেফটেনান্ট নাসির আহমদ

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

শালপ্রাংশু পাঠান যুবক, মুখে এখনও শিশুর সারল্য। বংশপঞ্জী যতদিনের জানা আছে, ততদিন ধরেই ওরা লড়ুয়ে লোক। পুরুষানুক্রমে সৈনিকবৃত্তিই ওদের একমাত্র বৃত্তি। নাসিরও ঢুকবে পল্টনে। তবে একটা গেরো বেধেছে।

গেরোটা এই। প্রায় দেড়শো বছর ওরা চাকরি করে আসছে ঐ গোরা ইংরেজদের। নাসিরের ঠাকুর্দা কর্ণেল পর্যন্ত হয়েছিলেন, কর্ণেল ইনতিয়াজ আহমদ, বর্মাযুদ্ধে বেহেস্ত লাভ করেন। হ্যাঁ, দেড়শো বছরের সম্পর্ক ওদের এই সাদা আদমিদের সঙ্গে, বাপদাদা চিরদিনই ষোল-আনা রাজভক্ত ছিলেন। কিন্তু নাসির ঐ দিকটাতে একটু খামতি আছে। কী জানি কেন, ইংরেজগুলোকে সে বরদাস্ত করতেই পারে না। ওদের চেহারাই নাসিরের অপছন্দ। ফর্সা? ফর্সা তো নাসিরেরাও সবাই। টকটকে গোলাপ ফুলের রং নাসিরের নিজেরই। কিন্তু সে-ফর্সা রংয়ের ভিতর থেকে ঐ উগ্র লালচে আভাটা ফুটে ওঠে না, যেটা সাহেবদের নাকে মুখে গালে কপালে রক্তের মতো লেপটে থাকে। ঐ লাল আভাটা দেখলেই গা সিরসির করে ওঠে নাসিরের, মনে হয় সাহেবটা বুঝি এইমাত্র কোন ভারতবাসীর রক্তপান করে এল, সেই রক্তেরই দাগ এখনও লেগে আছে ওর মুখে।

এরকম সৃষ্টিছাড়া বিতৃষ্ণা–

হ্যাঁ, সৃষ্টিছাড়াই বলতে হবে অবস্থা বিবেচনায়। আজ পাঁচ পুরুষ ধরে যে-বংশটা ইংরেজের সেবা করে আসছে জান কবুল করে, সেই বংশেরই একটা ছেলে যদি ইংরেজ মাত্রকেই রক্তপায়ী শ্বাপদ বলে ভাবতে থাকে, সেটা নিশ্চয়ই একটা সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার।

কী রকম করে এল এ-বিতৃষ্ণা? কেউ কিছু বুঝতে পারে না। তবে নাসিরের নিজের একটা অনুমান আছে। বয়স যখন তার বছর আষ্টেক, তখন বাড়ি থেকে ষোল মাইল দূরে আগ্রায় গিয়েছিল তাজমহল দেখতে। সেই সময় যমুনার কূলে হচ্ছিল একটা সভা। স্বদেশীওয়ালাদের সভা। বক্তৃতা দিচ্ছিলেন স্বনামধন্য পুরুষোত্তম ট্যান্ডন। রেখে-ঢেকে কথা বলা তাঁর অভ্যাস ছিল না। তিনি বলছিলেন–"চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর রক্ত শুষে খাচ্ছে চার কোটি মাত্র ইংরেজ।" যাদের লক্ষ্য করে তিনি বক্তৃতা করছেন, তাদের মনে কতখানি দাগ কাটল সে-কথা, তা কে জানে। কিন্তু বালক নাসির, চাচা রহমতের সঙ্গে যে তাজমহলের হাতা থেকে এই মাত্র বেরুলো, তার কানে সেই কথাটা গিয়ে বাজল একেবারে পয়গম্বরের বাণীর মতো। সে যেন চোখের উপরে দেখতে পেলো এক ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত মাতৃমূর্তি ধুলোয় পড়ে আছে যমুনার কূলে, আর সেই মূর্তির চারিপাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার দেহের নানাস্থান থেকে রক্ত শুষে খাচ্ছে সাদা সাদা নরাকৃতি শার্দূল। তাদের মুখগুলো সবই রক্তে লাল টকটকে একেবারে।

সেই যে এক লাইন বক্তৃতা ট্যান্ডনজীর, সেই যে মনশ্চক্ষে দেখা রক্তপানের উৎসব সাহেবদের, তা আজও ভুলতে পারেনি নাসির। অভিজ্ঞতাটা হয়েছিল তার আট বছর বয়সে, আজ তার বয়স এই চব্বিশ, এই ষোল বছরেও সে-অভিজ্ঞতার তিক্ততা আর বীভৎসতা এতটুকু মন্দীভূত হয়নি তার স্মৃতিতে।

কিন্তু যা বলছিলাম, গেরো বেধেছে নাসিরের পল্টনে ঢোকা নিয়ে। "আমি সৈনিক হব, কিন্তু ফিরিঙ্গীর নয়"–সাফ বলে দিয়েছে নাসির। বলেছে অবশ্য মায়ের কাছে। বাপ কড়া মেজাজের সুবেদার মানুষ, তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে এমন কথা তো দূরে থাকুক, কোনো কথাই এখনও নাসির গুছিয়ে বলতে পারে না। নিজে যদিও সে চব্বিশ বছরের তাগড়া জোয়ান আজ।

যা হোক, মায়ের কাছে কথাটা সে বলে ফেলেছে। এবং নিজে যতই সৃষ্টিছাড়া কথা শুনে হতবাক্ হোন না কেন, মাও তা যথাসম্ভব শীঘ্র পেশ করেছেন সুবেদারের কাছে। সুবেদার শুনে গুম হয়ে গেলেন। হঠাৎ কোনো কঠোর ব্যবহার করা সমীচীন মনে করলেন না। তা করলে হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। দেশ এখন বদলে গিয়েছে। আরও বদলাচ্ছে দ্রুত গতিতে। চারিদিকে স্বদেশীর হাওয়া। তরুণ নাসিরের দেহে ও মনে সে হাওয়ার ঝাপটা যদি লেগে থাকে, সেটাকে অস্বাভাবিক বলা যায় না কোনো মতেই।

সালটা ১৯৪১। সুভাষ বোস ইংরেজের কারাগার থেকে পালিয়েছেন। সারা ভারত জল্পনায় মুখর, উত্তেজনায় উদ্বেল। সুবেদার এই সময়ে ছেলেকে ডেকে বললেন কয়েকটি কথা। "ফিরিঙ্গির সৈনিক হতে রুচি নেই তোমার। কিন্তু সৈনিক-বৃত্তিকে যদি বৃত্তি বলে গ্রহণ করতে হয় তাহলে ফিরিঙ্গিরই সৈনিক হতে হবে তোমায়। অন্য কোনো রাজা নেই এদেশে এখন। অর্থাৎ সত্যিকার রাজা! যার সৈনিক রাখার দরকার বা ক্ষমতা আছে। কাজেই, যুদ্ধবিদ্যা যদি শিখতে হয়, ফিরিঙ্গির সৈন্যদলেই ভর্তি হয়ে যাও। তারপর, দেশ যদি সশস্ত্র বিদ্রোহের শক্তি অর্জন করে কোনোদিন, তোমার অভিজ্ঞতা দেশের সেবাতেই নিয়োগ করতে পারবে তুমি।"

"পারব?"—সোৎসাহে প্রশ্ন করল নাসির।

"ইংরেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে তার পরে পারবে। তাতে বেইমানি হবে না। শোন, সুভাষ বোস পালিয়েছেন। আমার মনে পড়ছে, শিবাজীও একদিন পালিয়ে ছিলেন। শিবাজীর পলায়নের ফলে মারাঠা জাতি স্বাধীন হতে পেরেছিল। সুভাষের পলায়নের ফলে যে ভারত স্বাধীন হবে না, একথা কে বলতে পারে? সারা দুনিয়ায় টালমাটাল অবস্থা চলছে, বিশ্বযুদ্ধের দরুন, কত পরাধীন জাতি যে স্বাধীন হয়ে যাবে এইবার, তার লেখাজোখা নেই। পুরোনো সব সাম্রাজ্য যে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যাবে, তার লক্ষণ দিনের দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে।"

নাসিরের তরফ থেকে আর আপত্তি উঠল না। লেখাপড়া শেখার গরজে ইংরেজের স্কুলে তাকে পড়তে হয়েছিল। এবার যুদ্ধবিদ্যা শিখবার জন্য ইংরেজের সেনাবাহিনীতে সে প্রবেশ করল। মনে তার খুব আশা, তার পুঁথিলব্ধ বিদ্যা এবং অস্ত্রচালনার বিদ্যা, দুইই সে একদিন মাতৃভূমির সেবায় নিয়োগ করতে পারবে। বেঁচে থাকুন সুভাষচন্দ্র, ভারত স্বাধীন হবেই। নাসিরের মতো যুবকেরা লাখে লাখে তাঁর পতাকার নীচে দাঁড়িয়ে লড়াই করবে সে-স্বাধীনতা আনবার জন্য।

সুবেদারের চেষ্টায় নাসির হাবিলদার পদ পেয়ে গেল ১৪ নং পাঠান রেজিমেন্টে। এ-ছাউনি থেকে ও-ছাউনি, পশ্চিম সীমান্ত থেকে পূর্ব সীমান্ত, ক্রমাগত ঠাঁইবদল করছে রেজিমেন্টটা, বিভিন্ন পরিবেশের বিভিন্ন রণকৌশল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাদের দুই বৎসর ধরে। পাঠান রেজিমেন্টের নাম আছে যোদ্ধা হিসেবে। লালমুখো কমান্ডারেরা সেই কথাই নিত্য নিত্য কানে দেয় রংরুটদের—"তোমাদের ঐতিহ্য হলো বীরত্বের এবং রাজভক্তির। সে-ঐতিহ্য কোনো পাঠান যোদ্ধা ভঙ্গ করবে না, এ-বিশ্বাস ব্রিটিশ জাতের আছে।"

বক্তৃতা শোনে, আর লালমুখোদের দম্ভ দেখে মনে মনে হাসে সৈনিকেরা। ঐতিহ্য? পাঠানের ঐতিহ্য হলো ভারত সিংহাসনে অধিষ্ঠানের ঐতিহ্য। গণতন্ত্রের যুগে আর সিংহাসন বলে কিছু থাকবে না। অন্যসব সম্প্রদায়ের সব ভারতীয়দের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে পাঠানেরাও নিজের দেশ নিজে শাসন করবে এবার। ঐতিহ্য তারা ভুলবে না, ঐতিহ্যের মর্যাদা কীভাবে বজায় রাখতে হয় নবযুগের পরিবর্তিত পরিবেশে, তা লালমুখো অবাঞ্ছিত বিদেশীদের কাছে তাদের শিখতে হবে না।

এল ১৯৪৩ সাল। পাঠান রেজিমেন্টকে বদলি করা হলো একেবারে সিঙ্গাপুর। জাপানী আক্রমণ ব্যাহত করতে হবে।

চলল যুদ্ধ। যুদ্ধ? ধারাবাহিক পশ্চাদপসরণ। সিঙ্গাপুর থেকে মালয়ের রবার বন, সেখান থেকে পেনাং। সেখান থেকে রেঙ্গুন। হটতে হটতে অবশেষে রেঙ্গুনে এসে আর পথ পাওয়া গেল না হটে যাবার। লালমুখ কালো করে মেজর জেনারেল হেন্ডারসন একদিন সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করলেন জাপানীদের কাছে।

আবার সিঙ্গাপুর, এবার জাপানীদের জাহাজে। কিন্তু জাপানীরা তাদের সঙ্গে ব্যবহার করছেন বন্ধুবৎ, তারা যে বন্দী, একথা যেন তাদের ভুলিয়ে দিতেই চান জাপানী সেনানীরা। কথাবার্তা যা কিছু হয়, তা ভারতের আসন্ন মুক্তি সম্পর্কেই।

সিঙ্গাপুরে বন্দীশিবির! শোভানল্লা! এরই নাম না কি বন্দীশিবির? তাহলে শ্বশুরবাড়ি আর কাকে বলে? এমন আদর-আপ্যায়ন মিষ্টি ব্যবহার সেনাবাহিনী সম্পর্কিত কোনো

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আবার
প্রকাশিত হয়েছে
ছাত্র-ছাত্রীদের একান্ত আপনার
সরল অভিধান
দাম : টাঃ ২০.০০
(সম্পূর্ণ পরিমার্জিত, পরিশোধিত এবং পরিবর্ধিত)
সবার মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে
দেব সাহিত্যের অনবদ্য সংকলন
হাসির হুল্লোড়
দাম : টাঃ ১৮.০০
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের
দুরন্ত এক অ্যাডভেঞ্চার-কাহিনী
সাহারার সন্ত্রাস
দাম : টাঃ ১২.০০
দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা—৯

যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হলে ফিরিঙ্গির সৈনাদলেই ভর্তি হয়ে যাও

জায়গায় যে পাওয়া যেতে পারে, একা নাসির কেন, তার সংগী সাথী কারো কোনোদিন জানা ছিল না। রোজই অভ্যাগত অতিথি আসছে কেউ না কেউ। আজ জেনারেল মোহন সিং, ইনি আই, এন, এর সর্বাধিনায়ক। কাল দুর্জয় সিং দেশপাণ্ডে, ইনি রাসবিহারী বোসের একান্ত সচিব, ভারতীয় স্বাধীনতাসংঘের সেক্রেটারি। অবশেষে একদিন সরাসরি প্রস্তাব এল বন্দী ভারতীয়দের কাছে, তারা ভারতীয় ইংরেজ গবর্নমেণ্টের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মিতে যোগদান করুক।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি। সংক্ষেপে আই, এন, এ,–আজাদ হিন্দ ফৌজ। মহাবিপ্লবী রাসবিহারী এ-ফৌজের পত্তন করেছেন গত বৎসর। এখন এর শক্তিবৃদ্ধি করে নতুন ভাবে সংগঠিত করা হচ্ছে। আগে মোহন সিং ছিলেন সেনাপতি এ-ফৌজের–এবার–এবার–

সর্বাধিনায়কের পদ গ্রহণ করবেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র।

নেতাজী! এখন আর সুভাষচন্দ্রকে কেউ নাম ধরে ডাকে না। জাপানী হোক, ভারতীয় হোক। প্রত্যেকেই তাঁকে ডাকে নেতাজী বলে। জাপান সরকারের মুখ্য ব্যক্তিদের কাছেও তিনি নেতাজী।

তিনি এসেছেন! ছয় হাজার মাইল সাবমেরিনে অতিক্রম করে জার্মানি থেকে জাপানে এসে পৌঁছেছেন এই অদ্ভুত কর্মী বীরচূড়ামণি।

বন্দীশিবিরে অনেকের মুখে অনেক জল্পনা, কিন্তু হাবিলদার নাসির আহমদের ভাবনাচিন্তার কিছু নেই। ইংরেজের সেনাদলে ভর্তি হওয়ার সময়ই তো তার পিতা তাকে অনুমতি দিয়ে রেখেছেন দেশ যদি সশস্ত্র বিদ্রোহের শক্তি অর্জন করে কোনোদিন, তোমার সেবা তুমি তারই সমর্থনে নিয়োগ করতে পারবে। অবশ্য আগে ইংরেজের চাকরি ছেড়ে, তারপরে।"

নাসির আহমদ, এবং তার দেখাদেখি আরও অনেকে সংগে সংগে জেনারেল হেণ্ডারসেনের কাছে পদত্যাগ পত্র লিখে পাঠিয়ে দিল। সেই রক্তবদন ভদ্রলোকও তখন জাপানী বন্দীশিবিরে। চিঠি পাঠাতে বেগ পেতে হলো না। সাধারণ অবস্থায় অবশ্য সৈনিকেরা নিজের ইচ্ছায় পদত্যাগ করতে পারে না এভাবে। কিন্তু এ-অবস্থাটা যা চলছে বর্তমানে, তাকে তো আর সাধারণের পর্যায়ে কেউ ফেলবে না! ভারত উদ্ধারের জন্য ভারতীয় জওয়ানেরা সংঘবদ্ধ হয়েছে, এখন বিদেশী লালমুখোদের আইনকানুনের স্থান কোথায় সে অভ্যুত্থানের মুখে?

আজাদ হিন্দ ফৌজের সমুখে যেদিন যোদ্ধৃ বেশে দেখা দিলেন নেতাজী বোস, সেদিন সমস্ত ভারতীয় সৈনিকের বুকটা আনন্দে গর্বে উৎফুল্ল, স্ফীত হয়ে উঠল। পাঠানেরা তাঁর ভিতর দেখল নবযুগের শের শাহকে, হিন্দুরা দেখল নবরূপে অবতীর্ণ ছত্রপতি শিবাজীকে।

তারপর শুরু হলো ভারতমুখী অভিযান। দীর্ঘ এক বৎসর ধরে আশায় উদ্দীপনায় আর অনির্বাণ বিজীগিষায় অনুপ্রাণিত, উন্মত্ত হয়ে রইল ফৌজের প্রত্যেকটি সৈনিক। হাবিলদার নাসির ইতিমধ্যে লেফটেনাণ্ট পদে উন্নীত হয়েছে। মাঝে মাঝে স্বাধীনভাবেই টুকরো টুকরো হামলা সে পরিচালনা করে। দুই একটা কাজে সে উর্ধ্বতন সেনানীদের কাছ থেকে প্রশংসাও পেয়েছে।–নেতাজীর কাছে নামও উঠেছে তার। একদিন প্যারেডের সময় তাদের লাইনের সামনে দিয়ে চলে যান নেতাজী, হঠাৎ নাসিরের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন–"তুমি নাসির আহমদ?"

"জী, নেতাজী"–আবেগে কেঁপে উঠল নাসিরের গলা, উত্তর দিতে গিয়ে। "তোমাকে সেদিন মেডাল দিলাম না? তোমার মুখখানা মনে আছে আমার। মনে থাকবেও।" নেতাজী এগিয়ে গেলেন, সহচর সেনানীদের নিয়ে। ক্ষুদ্র লেফটেনাণ্ট নাসির আহমদের মনে হলো সে আর ক্ষুদ্র নেই, তার মস্তক উন্নত হতে হতে বেহেস্তের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে।

তারপর এলো বর্ষা ঋতু। জাপান থেকে এলো না প্লেন, বর্ষাকালীন অভিযানের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে। কোহিমায় বিজয় পতাকা প্রোথিত করেও অবশেষে একদিন পশ্চাদপসরণ শুরু করতে হলো আজাদ ফৌজকে। ১৯৪৪-এর আগস্টের মাঝামাঝি সে-ফৌজকে দেখা গেল টামুর দিক–চিহ্নহীন মহারণ্যের মাঝখানে।

এই অরণ্যের উত্তর দিকের কোনো এক অংশে বনচর কাচিন দস্যুরা সাময়িক ছাউনি ফেলেছে একটা। পেশায় এরা দস্যুই বটে, কিন্তু সংখ্যায় আর সংগঠনে এদের একটা দল এক একটা সৈন্যদলেরই মতো। টামুর অরণ্যে এই যে দলটা ডেরা ফেলে আছে ইদানীং, এদের জনবল প্রায় হাজারের কাছাকাছি। কামান এদের নেই বটে, কিন্তু মেসিনগান আছে বিস্তর, তাছাড়া রাইফেল তো অগুন্তি। এদের কাছে সমরাস্ত্রের যোগান আসে চীন থেকে।

আজাদী ফৌজ পিছু হঠছে, কাচিন দস্যুরা ভাবল–অতর্কিতে হানা দিয়ে ওদের রসদ, এবং সম্ভব হলে কিছু অস্ত্রশস্ত্র লুণ্ঠন করে আনা যাক।

হাজার দস্যুর একটা সুসংহত সেনাদল চলমান আজাদী ফৌজকে আক্রমণ করল তাদের বাঁদিক থেকে।

কর্ণেল প্রীতম সিং ছিলেন ফৌজের ঐ অংশটার অধিনায়ক। তিনি আদেশ করলেন–"লেফটেনাণ্ট নাসির আহমদ, তুমি মোকাবিলা কর ওদের। গোটা ফৌজকে এই জঙ্গলে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারি না আমি।"

আদেশ দেওয়া মাত্র নিজের তিনশো জওয়ানের কোম্পানীটা নিয়ে ফৌজ থেকে আলাদা হয়ে গেল নাসির। মূল সেনাদল তাদের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল দূর থেকে দূরান্তে। তারা বেশ জানে যে অবস্থাগতিকে তিনশো আজাদীকে তাদের লেফটেনাণ্টসহ মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করে যেতে বাধ্য হলেন প্রীতম সীং।

হাজার কাচিনের সঙ্গে সেদিন মৃত্যুপণ লড়াই হলো তিনশো আজাদীর। বীরগতি লাভ করল সবগুলি ভারতীয়। কিন্তু তাতে কী? মূল ফৌজ তখন ওদের হামলার এলেকা পেরিয়ে চলে গিয়েছে।

সারা দেহে বুলেটের ক্ষত রক্তপদ্মের মালার মতো শোভা পাচ্ছে। শেষ শয্যা গ্রহণের সময় নাসিরের কানে বাজতে লাগল নেতাজীর বাণী–"তোমার মুখখানা মনে আছে আমার। মনে থাকবেও।"

সত্যই। টামুর এই ক্ষুদ্র যুদ্ধের কথা যখন শুনলেন নেতাজী বিষণ্ণ গম্ভীর মৃদুস্বরে বললেন– "নাসিরকে আমার মনে আছে। মনে থাকবেও।"

ছবি : দিলীপ দাস

অবাক কান্ড

শিল্পী শিম্পাঞ্জিনী

বালটিমোর চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জিনী বেটসির ৬৫টি ছবি বিভিন্ন প্রদর্শনীতে বিক্রি হয়েছে। একটি ছবির দাম হাজার টাকা অবধি উঠেছিল। লণ্ডন চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জি কংগোও নাম করা আঁকিয়ে। ৪০০ ছবি এঁকেছে সে। তবে, কংগো বেজায় মেজাজী। কোনো ছবি আঁকা শেষ হলে পেণ্ট ব্রাস গুটিয়ে নেবার পর ওকে যদি কেউ আবার ছবি আঁকতে বলে, তাহলে ক্যানভাসের ছবিটার ওপর এলোমেলো দাগ ও ক্রস চিহ্ন দিয়ে ছবিটা নষ্ট করে ফেলবে!

বেড়াল ও নেপোলিয়ন

নেপোলিয়ন অ্যাইলুরোফোবিয়াতে ভুগতেন। অর্থাৎ, বেড়াল দেখলেই ভয় পেতেন। পালাবার চেষ্টা করতেন। গলা শুকিয়ে যেত।

প্যারাসুটে প্রথম

এরোপ্লেন আবিষ্কারের অন্তত একশো বছর আগে প্যারাসুট আবিষ্কার হয়। প্রথম প্যারাসুট বানান জাঁ পিয়ের ফ্রাসোয়া ব্ল্যানসার্ড। ব্ল্যানসার্ড তাঁর প্যারাসুটে একটি কুকুরকে তুলে দেন। এই কুকুরটিই প্রথম প্যারাসুট থেকে ঝাঁপ দেয় ১৭৮৫ সালে।

মত্ত মাতঙ্গ

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপময়ী আসাম। অপরূপ সৌন্দর্যের ডালি নিয়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দাঁড়িয়ে আছে। বুকে জড়িয়ে আছে ঘন নীল পাহাড়ের পর পাহাড়। মালার মতো। কত অজস্র নদী-ঝর্ণা রূপালী ধারা নিয়ে ছুটে চলেছে। গহন গভীর এর অরণ্যাঞ্চল। শাল, সেগুন, পাহাড়ী বাদাম, পোমা, পাইন প্রভৃতি মূল্যবান গাছে ভরা। বুক-কাঁপান সব জন্তু জানোয়ারে ঠাসা। ভয়ংকর হাতি, বাঘ, গন্ডার, হরিণ, চিতা, ময়াল প্রভৃতি প্রাণীর বিচরণভূমি।

এরকমই এক পাহাড়ী অঞ্চলের এক চা বাগানে আমার ছেলেবেলা কেটেছে।

কামরূপ আসামের একটি জেলা। এই জেলার দক্ষিণ সীমায় একটি মাঝারি চা বাগান বড়দুয়ার। বসতি এবং চাষের অঞ্চলটুকু বাদ দিয়ে সবটাই গভীর অরণ্যের কোলে। বড় বড় পাহাড় ঘিরে রেখেছে বাগানটাকে। বাগানটা ছাড়িয়েই মেঘালয়ের গভীর খাসি জয়ন্তিয়া পার্বত্যাঞ্চল।

বাবা এই বাগানে কাজ করতেন। মেজদা এখনও করেন। আমাদের ছেলেবেলায় এ অঞ্চল প্রায় অগম্য ছিল। চা বাগানের গাড়ি ছাড়া কোনো গাড়ি ছিল না সে সময়। এখন অবশ্য অনেক উন্নত। সরকারী বাস চলে।

আশেপাশে যে সব গ্রাম আছে তাও বাগানের সীমার বহুদূরে। গভীর পাহাড়ী এলাকায়। গ্রামগুলির নামও অদ্ভূত। রাণীবাড়ি, রাজাপাড়া, মধুকি, খোকাপাড়া, খুবদিয়া এই রকম। সহজ সরল রাভা, কাছাড়ী, গাড়ো, খাসিয়ারা থাকে সে সব গ্রামে। এরা দিনের বেলায় খেত খামার করে। বেলা বেলি কাজ শেষ করে। সন্ধ্যা লাগতে লাগতেই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ে। কারণ সন্ধ্যার পর বন্যপ্রাণীর উৎপাতে বাইরে থাকা নিরাপদ নয়।

এরা সপ্তাহে একদিনই গ্রাম ছেড়ে বের হয়। চা বাগানের এলাকার মধ্যেই হাট বসে প্রতি বুধবারে। ওরা আসে সেই হাটে। তাও দল বেঁধে। ওরা খুব সহজ সরল লোক। একটু লবণ, অথবা অল্প চা পাতা, কিংবা খানিকটা সরষের তেলের বিনিময়ে একঝুড়ি কমলালেবু, বা একটা বড় চিতলমাছ বা এক ঝাঁকা টাটকা শাক-সব্জী দিয়ে যেত। ওরা খুব সাহসীও। নইলে থাকে কি করে ঐ রকম জংগলের মধ্যে! বাঘ, ভাল্লুক, হাতির মধ্যে।

প্রায় বাইশ তেইশ বছর আগের কথা। বাবা অবসর নিয়েছেন। আমরা আমাদের গৌহাটির বাড়িতে থাকি। একমাত্র মেজদাই থাকেন ওখানে। স্কুলের ছুটি-ছাটা পেলেই আমরা ছুটে যাই মেজদার কাছে। বড়দুয়ারে। কারণ ওখানকার আরণ্যক পরিবেশ কেমন যেন টানত আমাদের। অদ্ভূত মায়ার টান। আজও টানে!

১৯৬৩ কি '৬৪ হবে। গ্রীষ্মের ছুটি হয়ে গেছে। মেজদা খবর পেয়েই আমাকে আর ছোটবোনকে নিতে এলেন। আমাদের আনন্দ দেখে কে! সানন্দে রওনা দিলাম।

তাজ্জব ব্যাপার। গিয়ে দেখি সবারই কেমন মনমরা আতঙ্কিত ভাব। সন্ধ্যার পর থেকে চারদিক নিঃঝুম। রাতে যে চৌকিদার ঘণ্টা পেটাত, সেও বাইরে আসে না। কলঘরের বারান্দা থেকেই ঘণ্টা পেটায়।

সকাল বেলায় আরো মজার ব্যাপার। চা বাগানের কুলিরা পাতা তুলতে বা আগাছা বাছতে এমনিতেই দলবদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সেবারে দেখি সঙ্গে সবার হাতেই একটা না একটা হাতিয়ার আছে। কারো হাতে দা, কারো হাতে কুড়ুল, আবার কেউ বা তীর ধনুক নিয়ে চলেছে। সঙ্গে হাজিরাবাবু বা সর্দারদের কারো কারো হাতে বন্দুক। বন্দুক দিয়েছেন চা বাগান কর্তৃপক্ষ। সবাই শঙ্কিত।

ভীষণ কৌতূহল হলো। বিকেলে মেজদা আসতেই জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে সবাই কাকে ভয় পাচ্ছে? কি হয়েছে?

মেজদা গম্ভীর। বললেন, ও কিছু না, ঘরের বাইরে যেও না যেন। বিকেলে একটা ক্যারাম এনে দেব। সন্ধ্যার পর ঘরে বসে খেলবে।

জবাবটা মনের মতো না হওয়াতে ভীষণ দমে গেলাম। কৌতূহলটা তীব্রতর হলো।

বিকেলে মেজদা সত্যিই একটা ক্যারাম বোর্ড এনে দিলেন। মেজবৌদি বিকেলের চা-জলখাবার দিয়ে গেলেন। খেয়ে দেয়ে ক্যারাম খেলছি আমি আর ছোটবোন। এমন সময় বাগানের কম্পাউন্ডার বাবু এলেন। বন্তীরাম কম্পাউন্ডার। আমাদের খুব স্নেহ করতেন। আমরা ডাকতাম বন্তীদা বলে।

মনটা তো আমার উস্‌খুস্‌ করছিলই। বন্তীদাকে পেয়ে চেপে ধরলাম। সেই একই প্রশ্ন—সবাই কেন এত শঙ্কিত। ব্যাপার কি!

এবারে আসল কথা বেরিয়ে এল। ওঁর কাছে শুনলাম বাগানের আশেপাশের অঞ্চলগুলোতে একটা প্রকাণ্ড গুণ্ডা হাতির উপদ্রব শুরু হয়েছে। বহু লোকের প্রাণ গেছে তার হাতে। তাই এত আতঙ্ক। শুনে আমারও মনটা কেঁপে উঠল ভয়ে। সত্যিই তো ভয়ের ব্যাপার তা হলে।

জংলা হাতিরা সাধারণত যূথবদ্ধ হয়ে অর্থাৎ দল বেঁধে চলে। পালের গোদা থাকে একটা মদ্দা দাঁতাল হাতি। দল যদিও চালায় দলের সব থেকে বুড়ো মাদি হাতি। গোদার কাজ বিপদে আপদে দলের জন্য রুখে দাঁড়িয়ে বিপদের মোকাবিলা করা। প্রাকৃতিক নিয়মে যখন গোদা হাতি দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন দলের অন্য কোনো মদ্দা দাঁতাল হাতি তাকে পরাস্ত করে দল থেকে বার করে দেয়। সে আর দলে ফিরতে পারে না। দলছুট হয়ে একলাই তাকে আহার-বিহার করতে হয়। এই অবস্থায় হাতিটা গুণ্ডা বা পাগল হয়ে যায়। তখন সে হয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর।

এছাড়া আরো একটা কারণেও হাতিরা গুণ্ডা হয়। কোনোক্রমে কোনো শিকারীর গুলি খেয়ে জখম হলেও হাতি ক্ষেপে যায়। সে তখন জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে এসে প্রাণঘাতী কার্যকলাপ চালায়।

আমি যে গুণ্ডা হাতিটার কথা বলছি, সেটা ছিল ভীষণ ক্ষ্যাপা। বহু লোকের প্রাণ নিয়েছে। বড়দুয়ার এবং আশ-পাশের লোকেরা তাই ত্রাস আর আতঙ্কের মাঝে দিন কাটাচ্ছিল। এই বুঝি জঙ্গল ফুঁড়ে বেরিয়ে এল কালান্তক যমদূত! এই বুঝি কারো প্রাণ গেল!

ওর প্রথম শিকার মধুকি গাঁয়ের কোনো এক হতভাগ্য যুবক ভগীরাম। বেচারা ভোর রাতে কুকুরের ডাক শুনে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। ভেবেছিল হয়তো মুরগীর খোঁয়াড়ে শেয়াল ঢুকেছে। বুঝতে পারেনি। যখন বুঝল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। কুঁড়ে ঘরের কোণায় কলাবাগানের আধো অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল ক্ষ্যাপা হাতিটা। বিশাল পাহাড়ের স্তূপের মতো। ওকে দেখেই শুঁড় তুলে চিৎকার করে তেড়ে এল এবং ওকে মাটিতে ফেলে থেঁতলে দিল। মরার আগে ভগীরামের হাতের কুকরীর কোপে তার বাঁ কানের তলার দিকটা ছিঁড়ে ঝুলে পড়ে। পরবর্তীকালে ওটাই ছিল শিকারীদের কাছে হাতিটাকে সনাক্তকরণের একমাত্র চিহ্ন।

ওর পরবর্তী শিকার প্রায় বারোজন লোক। মধুকির পাশ্ববর্তী রাজাপাড়া গ্রামে। চারিদিক শালবনে ঘেরা গ্রামটা।

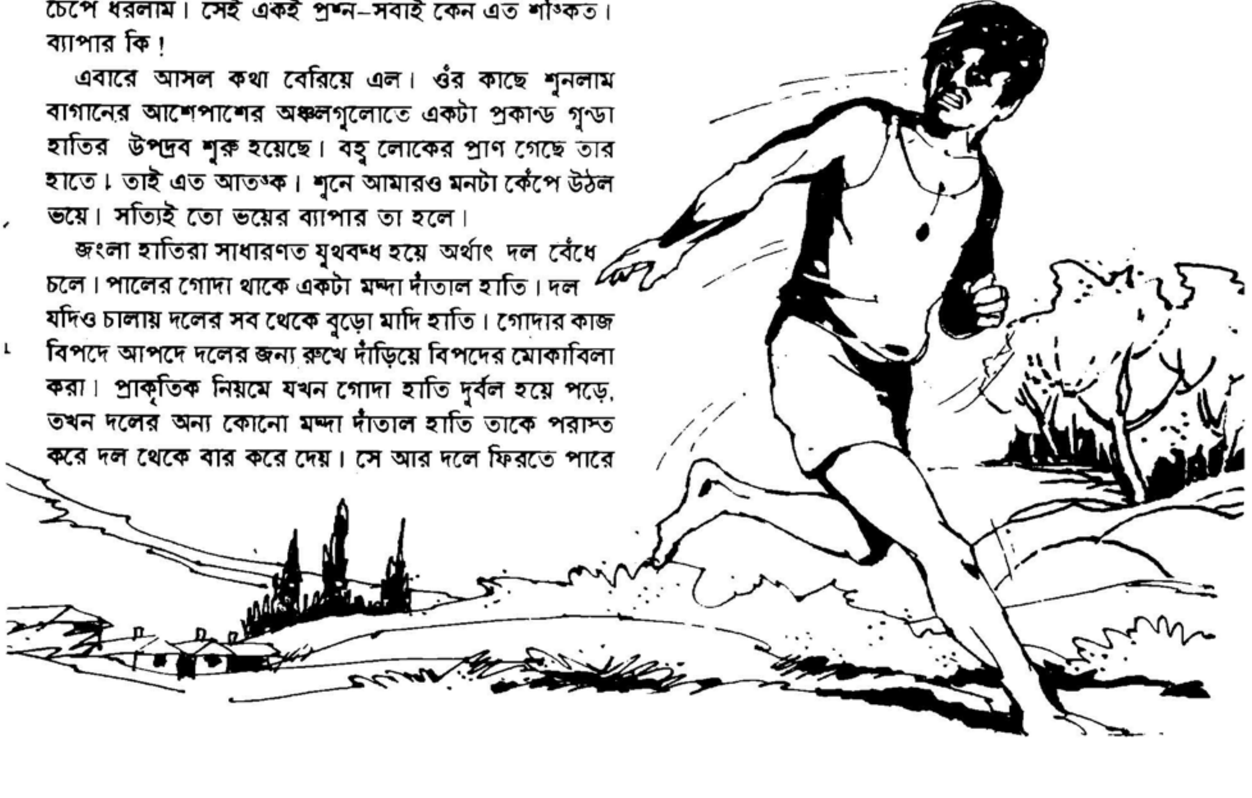

ওখানেই হঠাৎ সন্ধ্যার সময় জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল ও। সঙ্গে সঙ্গে ধুন্ধুমার কান্ড। এক নিমেষে লুটিয়ে পড়ল ছয় সাতটা কুঁড়েঘর। তারপর পলায়মান লোকগুলোকে পায়ের তলায় দুমড়ে মুচড়ে সে চলে গেল প্রলয় ঝড়ের মতো।

খবরটা ফরেস্ট অফিসে দেওয়া সত্ত্বেও তাঁরা নীরব। তাই হাতিটাকে মারা যাচ্ছিল না। আইনগত বাধায়। ওঁরা ক্ষ্যাপা ঘোষণা না করা পর্যন্ত কোনো হাতি মারা যায় না।

ইতোমধ্যে আরো ছয়-সাতজন লোক ওর রোষের শিকার হয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে। কেউ ধানক্ষেতে, কেউ বা কাঠ কাটতে গিয়ে, কেউ হয়তো গরু-ছাগল চরাতে গিয়ে।

সব জায়গায়ই কানকাটা হাতিটাকেই দেখা যায়। এ কথা প্রমাণিত হওয়ার পর ফরেস্ট রেঞ্জার সাহেব ওকে ক্ষ্যাপা ঘোষণা করে দিলেন। কিন্তু শিকারীরা তাকে কিছুতেই বাগে পাচ্ছিল না। এমনিতেই পার্বত্য অরণ্যাঞ্চল। তার ওপর হাতিটা এক জায়গায় থাকতো না এক নাগাড়ে, প্রায় পঁচিশ বর্গমাইল জুড়ে ওটা চষে বেড়াত এখানে দু'দিন, ওখানে দু'দিন করে।

চা বাগান কর্তৃপক্ষ বাগানের বসতি অঞ্চল ঘিরে বড় বড় মাচান বেঁধে পাহারা বসিয়েছিল। ওখানে দিনরাত লোকজন ক্যানেস্তারা, মশাল, পটকা নিয়ে বসে থাকত। হাতিটাকে দেখলেই ক্যানেস্তারা পেটাত, পটকা ফাটাত। রাতে থাকতো মশাল। হাতিটা ভয় পেয়ে দূরে পালিয়ে যেত।

গভীর রাতে ওদের ক্যানেস্তারার শব্দে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যেত আমাদের। নিঃঝুম, নিশুতি রাতে ভয়ের চোটে শিরদাঁড়া বেয়ে কিসের যেন স্রোত বয়ে যেত। সেই সঙ্গে রাতের গভীরে দূর থেকে ভেসে আসত হাতি-তাড়ুয়াদের তীক্ষ্ণ 'ওই–ই–ই–হুঃ–হুঃ–হুঃ–হেই'। সে চিৎকার কানে এলেই আমাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠত। বুকটা ঢিপ ঢিপ করত।

আজো বেশ মনে পড়ে সেই বুধবারটার কথা। হাটবার। দূর-দূরান্তের লোকজন হাটে আসছে। কেনা-বেচা চলছে। বেলা দশটা নাগাদ আমার মেজদাও বেরিয়ে গেলেন। কিছু শাক-সব্জী ও মাছ কেনার জন্য। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ফিরে এলেন মেজদা, কিন্তু কেমন যেন ভীতগ্রস্ত ভাব। মেজবৌদিকে বললেন শুনলাম–হাতিটা নাকি একটু আগেই এক গারো মহিলা আর তার দুই শিশুসন্তানকে আছড়ে মেরে ফেলেছে।

ওরা হাটে আসছিল দলবলের সঙ্গে। রানীবাড়ি গ্রাম থেকে। ওখান থেকে আসতে হলে ছোট্ট একটা নদী পেরোতে হয়। মহিলার সঙ্গে ছোট বাচ্চা থাকায় ক্রমেই পেছিয়ে পড়ছিল। এ পারে যখন এল তখন ও বাচ্চাদুটোকে নিয়ে নিঃসঙ্গ। এপারে এসেই হঠাৎ একটু দূরে ঝোপের আড়ালে হাতিটাকে দেখতে পেল। ওদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। ও ভাবল হয়তো চা বাগানেরই পোষা হাতি। তাই সহজ সারল্যে বাচ্চাদুটোকে আনন্দ দেওয়ার জন্য বলল, ঐ দেখ হাতি দেখ, ওরে হাতি দেখ।

ব্যস, ঐ মুখের শব্দটাই হলো কাল। ঐ শব্দ না করলে হয়তো কিছুই হতো না। হাতিটা আওয়াজ শুনে ভীষণভাবে তেড়ে এসে ওদের থেঁতলে দিল।

আমরা বেলা বারোটা নাগাদ থেঁতলানো শবগুলো দেখলাম। সে বীভৎস দৃশ্য ভোলা যায় না। তখনই চা বাগানের কর্তৃপক্ষ ঠিক করল হাতিটাকে মারতেই হবে যে করে হোক।

বাগানের জীপ ছুটে বেরিয়ে গেল গৌহাটির উদ্দেশ্যে বিখ্যাত শিকারী বীরেন ফুকনকে নিয়ে আসার জন্য। সঙ্গে গেলেন ঐ অঞ্চলের রেঞ্জার সাহেব।

এদিকে কিছু লোক বেরিয়ে গেল বন্দুক নিয়ে। হাতিটার ওপর দূর থেকে নজরদারির জন্য। ঘণ্টা পিটিয়ে সবাইকে সাবধান করে দেওয়া হলো।

বিকেল চারটে নাগাদ ফুকন সাহেব এলেন। সঙ্গে কয়েকটা রাইফেল আর বিরাট সাইজের দুটো অ্যালসেসিয়ান কুকুর নিয়ে। খুব শক্ত-সমর্থ, উঁচু-লম্বা চেহারা। আসামের এক সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। তখন তাঁর বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বৎসর ছিল।

উনি আসাতে সবার খুব আনন্দ হলো। কারণ তাঁর অভিজ্ঞতার কোনো তুলনা ছিল না। এ শিকারের ভার তাঁর হাতে পড়ায় সকলের মনে ভরসা এল।

সন্ধ্যার দিকে উনি পোশাক-আশাক পরে তৈরি হয়ে নিলেন। নজরদারী বাহিনীর লোকদের কাছে জানতে চাইলেন তারা শেষবার কোথায় হাতিটাকে দেখেছে। সবাই একবাক্যে জানাল নদীর ধার ধরে হাতিটাকে বাংলা বস্তির দিকে যেতে দেখেছে। বাংলা বস্তি চা বাগানের একটা কুলি লাইন।

ঐ বস্তিটা উঁচু টিলা মতো জায়গায়। বস্তীর পেছনে গভীর জঙ্গল অনেকদূর পর্যন্ত। তারপরই উঠে গেছে পাহাড়। আগেই বলেছি বস্তিটা বেশ উঁচু জায়গায়। তার দক্ষিণ দিকে ঢাল বেয়ে বেশ খানিকটা নেমে গেলেই দেখা যায় ধানক্ষেত। আর ধানক্ষেত ক্রমে সরু হয়ে পাহাড়ের দিকটায় চলে গেছে। সরু দিকটা বেশ খাদে। উত্তর দক্ষিণের দুটো দিকেই বেশ উঁচু পাহাড়ী ঢাল। ছাড়া ছাড়া শাল বনে ছাওয়া। ওখানে বস্তির লোকেরা গাছের উপর বারোমাস মাচান বেঁধে রাখে। ধানক্ষেত পাহারা দেওয়ার জন্য।

ফুকন সাহেব যখন নজরদারী বাহিনীর কাছ থেকে খবর নিচ্ছিলেন তখন সন্ধ্যা সাতটা হবে। হঠাৎ বাংলা বস্তি থেকে একটি ছেলে ছুটে এল। তার কাছে খবর পাওয়া গেল এইমাত্র হাতিটাকে ঐ ধানক্ষেতে দেখা গেছে।

ফুকন সাহেব তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন একটা রাইফেল নিয়ে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে চললেন বাংলা বস্তির দিকে। আরো দুটো রাইফেল নিয়ে সঙ্গে গেল দুজন অভিজ্ঞ কুলি

ঐ শব্দটাই কাল হলো

সর্দার। আর সেই ছেলেটি। পেছনে পেছনে সেই ভয়ঙ্কর কুকুর দুটো।

আমরা সবাই ভয়ে, উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় যে যার ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে দিলাম। ভয়ে বুক ঢিপ ঢিপ করতে থাকল। কারণ একটা মত্ত হাতির কাছে কোনো ঘরই নিরাপদ নয়। আর স্টাফ কোয়ার্টার এরিয়া থেকে বাংলা বস্তি খুব দূরে নয়। হাঁটা পথে মাত্র মিনিট পনেরোর দূরত্ব। ঘরে বসে জয় গণেশ, জয় গণেশ জপতে লাগল সবাই। দুরু দুরু বক্ষ সবারই। এই বুঝি হুস-হাস, ধুপ-ধাপ শব্দে ছুটে আসে মৃত্যুদূত।

এ ভাবে কতক্ষণ কেটে গেল, বোঝা যাচ্ছিল না। রাত প্রায় ৯'টা হবে। জঙ্গলের রাজ্যে রাত ন'টা অনেক রাত।

হঠাৎ আমরা পর পর দুটো আওয়াজ পেলাম রাইফেলের। সেই সঙ্গে কুকুরের ডাক ও হাতির চিৎকার মিলিয়ে এক বিকট শব্দ ভেসে এল। কিছু লোকের হৈ হৈ আওয়াজও পেলাম। তারপরই সব স্তব্ধ। আমরা তখনও ঘরে বসে কাঁপছি। টের পেলাম আশেপাশের কোয়ার্টারগুলোতেও একই অবস্থা। কারণ আগেই বলেছি কোয়ার্টার এরিয়া থেকে বাংলা বস্তি খুব কাছেই। বাংলা বস্তি উঁচু জায়গায়। গুলি লাগলে হাতিটার উঁচু দিকে না যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। গুলি ফসকে গেলে তার যে কোনো দু'দিকে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। এক ধানক্ষেতের সরু দিকটা ধরে খাদের মধ্য দিয়ে গভীর জঙ্গলে। অথবা, উল্টো দিকে নদীর ধার ধরে সোজা আমাদের স্টাফ কোয়ার্টার এরিয়ার দিকে।

রাতটা জেগেই কাটালাম আমরা উত্তেজনায়। ভোর তিনটে নাগাদ আবার পর পর তিনটে গুলির শব্দ পেলাম। আর ঠিক সেই রকম লোকজনের হৈ হৈ এবং কুকুরের গর্জন ভেসে এল। মনে হলো উত্তেজনায় প্রাণটা বুঝি গলার কাছে উঠে এসেছে।

লোকজনের হৈ হৈ বস্তির দিক থেকে সমানেই ভেসে আসছিল, দেখতে দেখতে ভোরের আলো ফুটে উঠল। আমরা জানালাগুলো খুলে দিলাম। দেখি আশ পাশের কোয়ার্টারের লোকজনও জানালা খুলে উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে বাংলা বস্তির রাস্তার দিকে।

কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম অনেক লোকের সঙ্গে ফুকন সাহেব এগিয়ে আসছেন। ক্লান্ত, অবসন্ন রুক্ষ চেহারা। গায়ের পোশাকে ধুলো-বালি মাখা। জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু মুখে নির্মল হাসি। বুঝলাম উনি কৃতকার্য হয়েছেন।

আমরা আনন্দে হৈহৈ করে বেড়িয়ে পড়লাম তাঁর আস্তানার দিকে। কোয়ার্টার এরিয়ার গায়েই, নতুন ফ্যাক্টরিতে সব ঘটনা বিশদভাবে জানার জন্যে। দেখলাম মেয়ে-পুরুষ, কুলি-বাবু সবাই ভিড় করেছে ওখানে।

হাতির খবর শুনে ফুকন সাহেব তো ছুটে বেরিয়ে গেছিলেন বাংলা বস্তির দিকে। সেখানে গিয়ে দেখেন প্রায় শ'খানেক লোক লাঠি, টাঙ্গি, তীর-ধনুক নিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। ফুকন সাহেবকে দেখে সবাই তার সঙ্গী হতে চাইল।

ফুকন সাহেব পড়লেন মহা সমস্যায়। অত লোক সঙ্গে

গেলে হাতিটা তো ভয়েই পালিয়ে যাবে, নয়ত প্রচণ্ড ক্ষেপে তুলকালাম কাণ্ড বাধাবে। তাই সবাইকে নিরস্ত করলেন তিনি। সঙ্গীদের নিয়ে এগিয়ে গেলেন স্পটের দিকে, তখন চারিদিক গাঢ় অন্ধকারের ওড়নায় ঢাকা পড়ে গেছে। উনি সেই পাহাড়ী ঢালটার দিকে গেলেন।সেখান থেকে দশ বারো ফুট নিচে ধানক্ষেত। অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করতে পারা যাচ্ছিল না। সঙ্গী তিনজনকে নিয়ে একটা মাচানে উঠে বসলেন ফুকন সাহেব।

তার অভিজ্ঞ কান খাড়া হয়ে রইল কোনো শব্দের প্রতীক্ষায়। তাঁর সঙ্গীরাও জঙ্গলেরই মানুষ। জঙ্গলের জীবজন্তুর হাবভাব বেশ ভালই বোঝে।

হঠাৎ ধানক্ষেতের মধ্যে একটা ফট্ ফট্ আওয়াজ হলো। ফুকন সাহেব ও সঙ্গীরা বুঝলেন হাতিটার কান ঝাপটানোর শব্দ। খুব কাছেই আছে কিন্তু গভীর আঁধার, তাই কিছুই দেখতে পেলেন না। শুধু ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালে দেখলেন রাত ন'টা বাজতে তিন মিনিট বাকি। তাঁর কুকুর দুটোও বিনা শব্দে চুপ-চাপ টান টান হয়ে বসল।

ফুকন সাহেব তাঁর হাতের পাঁচ ব্যাটারির টর্চটা জ্বেলে দিলেন। ফোকাস সোজা গিয়ে পড়ল দশ-বারো ফুট নিচে ধানক্ষেতে। তাঁরা রুদ্ধশ্বাসে দেখলেন মাচান থেকে কিছু দূরেই হাতিটা দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ কানটা কাটা। শুঁড় তুলে তাকিয়ে আছে সোজা আলোর উৎসের দিকে।

ফুকন সাহেব দেরি না করে রাইফেল তুললেন। কিন্তু হাতিটা বিপদের আভাস পেয়েই হয়তো তখন সরু দিকটা ধরে পাহাড়ের দিকে চলে যেতে চাইল। ফুকন সাহেব দেখলেন বিপদ। ওদিকে গভীর জঙ্গল। একবার পালিয়ে গেলে ওটাকে পাওয়া মুশকিল। তাই তিনি কুকুর দুটোকে উস্কে দিলেন। কুকুরের ডাকে হাতিটা ঘুরে তেড়ে এলো, অমনি ফুকন সাহেবের রাইফেল পর পর দু'বার আগুন উগরে দিল। হাতিটা প্রচণ্ড চিৎকারে চারিদিক কাঁপিয়ে সরু খাদটার দিকে ছুটে গেল। ও দিকেই গভীর জঙ্গল।

টর্চের আলো গুলি করার মুহূর্তে কেঁপে ওঠায় উনি বুঝলেন না গুলি ঠিক কোথায় লেগেছে। তবে গুলি যে লেগেছে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ শিকারী নিশ্চিন্ত ছিলেন। হাতির চিৎকারই তার প্রমাণ। কিন্তু তখন কিছু করার ছিল না। সেই মুহূর্তে হাতিকে অনুসরণ করার ঝুঁকি তিনি নিলেন না। স্তব্ধ উৎকণ্ঠায় মাচানের ওপরেই রাতটা কাটিয়ে দিলেন ভোরের প্রতীক্ষায়।

ভোরের আলো ফুটতে ওঁরা রাইফেল নিয়ে ছুটলেন টিলার ওপর দিয়ে শালবনের ফাঁকে ফাঁকে। ওঁদের দৃষ্টি দক্ষিণের সরু খাদটার দিকে। বেশ খানিকটা যাওয়ার পর কুকুর দুটো কেমন অধীর হয়ে উঠল। এক জায়গায় গিয়ে শিক্ষিত কুকুর দুটো মাটি আঁচড়াতে লাগল। ওঁদের দৃষ্টি সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণের ঢাল বেয়ে খাদের উপর গিয়ে পড়ল। দেখলেন হাতিটা সেখানে চিৎ হয়ে ছটফট করছে। মুখে চাপা গোঙানি। পেছন দিকটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে। ভীষণভাবে জখম হয়েছে।

ফুকন সাহেব বুঝলেন হাতিটাকে মেরে ফেলতে হলে ওর কপালে গুলি করা দরকার। কুকুর দুটোকে নিয়ে ঢাল বেয়ে সোজা খানিকটা নেমে গেলেন। শ্বাসরুদ্ধকর কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর তিনি একটা শুকনো ডাল হাতিটার গায়ে ছুঁড়ে মারলেন।

ভীষণ শব্দে দিগ্বিদিক্ কাঁপিয়ে হাতি ঐ অবস্থায় তেড়ে এল ওপরের দিকে। সোজা ফুকন সাহেবকে লক্ষ্য করে। ফুকন সাহেব প্রস্তুত ছিলেন। তিনি আরো ওপরের দিকে ছুটলেন। হাতিও উঠে আসছে। কয়েক গজের ব্যবধান। কুকুর দুটো প্রচণ্ড চিৎকার করে হাতিকে বাধা দিতে চাইছে। হাতিটার গায়ে অবশ্য আর জোর ছিল না তেমন। সেই ফাঁকে ফুকন সাহেব একটা মোটা শাল গাছের আড়ালে দাঁড়ালেন ওপরে এসে।

হাতিটা ছুটে আসছে ভীষণ ভাবে। শুঁড় উঁচু। চোখে মুখে ভয়াল হিংস্রতা। কুকুর দুটোও ঠেকাতে পারছে না আর। ফুকন সাহেব বুঝলেন ঘাবড়ে গেলে মৃত্যু অনিবার্য। তাই হাত দশেকের ব্যবধানের জন্য অসীম সাহসে অপেক্ষা করে রইলেন। তারপরই তাঁর রাইফেল গর্জে উঠল পর পর তিনবার। গুলি সোজা গিয়ে কপাল ফুঁড়ে দিল।

বিশাল দেহ নিয়ে হাতিটা গড়িয়ে পড়ে গেল খাদে। তারপর সব স্তব্ধ। আর উঠল না।

ফুকন সাহেব তখন উত্তেজনায় কাঁপছেন। সঙ্গীরা গিয়ে চট করে ধরে ফেলল তাঁকে। উনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ফিরে এলেন ডেরায়। ক্লান্ত অবসন্ন।

ফুকন সাহেবের কাছ থেকে সব শুনে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। সেই ত্রাস-সঞ্চারী হাতিটার শব দেখতে। বেশ বেলা হয়ে গেছে ততক্ষণে। আশ পাশের গ্রামগুলো থেকেও মিছিলের মতো লোকজন আসছে খবর শুনে।

যেতে যেতে আমার মনটা কেমন এক বেদনায়, মমতায় মুচড়ে উঠছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল কত নিঃসহায়তা এবং নিঃসঙ্গতায় হাতিটা গুণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। তাই তাকে আজ প্রাণ দিতে হলো।

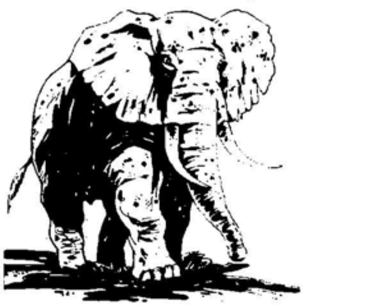

ছবি: ইন্দ্রনীল ঘোষ

আই.ও র হাতছানি

অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

আজ ১৪ই এপ্রিল ২১৮৪ সাল। আমার মেয়ে দেবিকা ডায়েরিতে লিখছিল-আমরা পৃথিবী থেকে প্রায় ৩৯ কোটি মাইল দূরে বৃহস্পতির অন্যতম বৃহৎ উপগ্রহ আই.ও র (I.O.) বুকে নামতে চলেছি। উপগ্রহটা আমাদের চাঁদের মতই। পাহাড় আর গর্তে ভরা। পাহাড়গুলো অবশ্য সব জীবন্ত-মৃত আগ্নেয়গিরি। কোনো কোনোটা আমাদের হিমালয়ের চেয়েও বেশি উঁচু। এখানে জল নেই। বাতাস নেই। ফলে সবুজের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। চাঁদ মঙ্গলের মতই ন্যাড়া। দেখলে বিরক্তি লাগে।

আমার বাবা একজন মহাকাশ-বিজ্ঞানী। বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহে তিনি খনিজ পদার্থের খোঁজ করেন। আজ সৌরজগতের দিকে দিকে মানুষের বসতি ছড়িয়ে পড়ছে। খনিজ–বিশেষ করে আণবিক শক্তিসম্পন্ন ধাতুর বড়ই প্রয়োজন। বাবা তাঁর ছোট মহাকাশযান 'বিজয়ে' চড়ে প্রায়ই গ্রহ গ্রহান্তরে পাড়ি দেন। এবারও পাড়ি দেবার জন্যে বেরিয়েছিলেন। আমি সঙ্গে যাব বলে বায়না করেছিলাম। কিন্তু বাবা নেন নি। নানান ওজর দেখিয়ে মহাকাশ বন্দরে চলে গিয়েছিলেন। আমি কিন্তু মনে মনে বলে চলেছিলাম, বাবা যেন ফিরে আসে। বাবা যেন ফিরে এসে আমায় নিয়ে যায়, কারণ গ্রহ গ্রহান্তরে যাবার আমার ভীষণ শখ। বড় হয়ে আমি বাবার চেয়েও বড় অভিযাত্রী হব। আরও দূর নক্ষত্রমন্ডলে, ছায়াপথের অপর প্রান্তে–সম্ভব হলে 'এন্ডোসিডা' ছায়াপথে পাড়ি দেব। এন্ডোসিডা আমায় বড় বেশি টানে।

দেবিকার লেখায় বাধা পড়ল। ও জিজ্ঞেস করল, বাবা, আমরা এপ্রিলের ৭ তারিখেই তো যাত্রা করেছিলাম? না?

সামনে যন্ত্রগণকের 'রিডিং'-এর ওপর চোখ রেখে আমি বললাম, হ্যাঁ, মা, পথে, চাঁদে আর মঙ্গলে আমাদের থামতে হয়েছিল। কিন্তু কেন, মা? কি লিখছ? গল্প?

–না, বাবা, ডায়েরি লিখে রাখছি। হয়ে গেছে। মঙ্গল গ্রহের কন্ট্রোলের 'রাও'কাকা আমায় বলে দিয়েছে। ফেরার পথে ওকে ডায়েরি দেখাতে হবে। নইলে, মঙ্গলে আটকিয়ে রাখবে। ঐ কাঁচ ঢাকা শহর আমার ভালই লাগে না।

–তাই বুঝি। হাসলাম আমি। বেশ তো, তাহলে লিখে রাখ। ছাড়া পেয়ে যাবে।

এবার আমরা নামতে চলেছি। কে কোথায় নামব, গোটা উপগ্রহটাই আগ্নেয়গিরিতে ভরা। তবে, একশ' মাইলের মতো একটা সুবিধেমত জায়গা দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে কাছের আগ্নেয়গিরিটাও প্রায় শতখানেক মাইল দূরে হবে।

দেবিকা বলে উঠল, কি মজা হবে বাবা। আমি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত দেখি নি কখনও।

আমি বললাম, তা আর দেখবে কেমন করে? পৃথিবীতে তো হাতে গোনা যায়। তাও বেশির ভাগই অনিয়মিত। যাক শখ নিশ্চয় মিটবে। আমরা থাকতে থাকতে দু-একটার অগ্ন্যুৎপাত নিশ্চয় শুরু হয়ে যাবে। কারণ, ভূতাত্ত্বিক দিক দিয়ে আই.ও. এখনও ভীষণ সজীব।

সাবধানে মহাকাশযানটাকে নির্ধারিত জায়গায় নামালাম। নামবার জন্যে মহাকাশচারীর পোশাক পরে মেয়ে আমার প্রস্তুত হয়ে ছিল। তার আর তর সইছিল না। কিন্তু অপেক্ষা করতেই হবে। যন্ত্রগণকেরা কাজ করছিল। তাদের কাছ

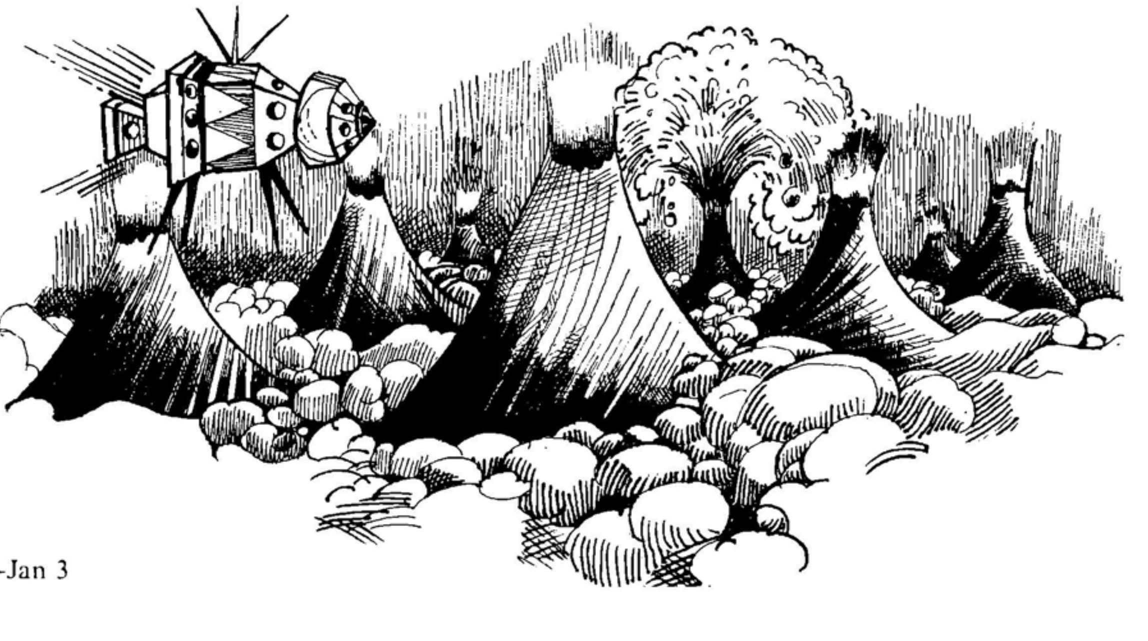

কলিকাতা পুস্তক মেলা ১৯৮৭

২৮ জানুয়ারী — ৮ ফেব্রুয়ারী

স্থান : ময়দান (রবীন্দ্রসদনের সামনে)

প্রতিদিন ২টা থেকে ৮টা

ও ছুটির দিন ১২টা থেকে ৯টা

(টিকিট বিক্রি সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত)

স্কুল ছাত্রছাত্রীদের জন্য রবিবার ও ছুটির দিন
ছাড়া প্রতিদিন ২টা থেকে ৫টা প্রবেশ মূল্য নাই

উদ্যোক্তা

পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুক সেলার্স গিল্ড

৫এ, ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা-৭০০০৭৩

ফোন : ৩১-১৫৪১

থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত কখনই অজানা মাটিতে পা দিতে নেই।

মেয়ে তাড়া দিচ্ছিল। আমি বললাম, দাঁড়াও মা, একটু অপেক্ষা কর। সব আগে দেখে নিই।

—অত দেখার কি আছে ? প্রাণ তো নেই। সুতরাং আক্রান্ত হবার ভয়ও নেই। বাতাসের প্রয়োজনও নেই। মহাকাশচারীর পোশাক তো পরেই আছি।

হাসলাম।—আছে মা। এটা আমাদের নিয়ম। নামবার আগে ভাল করে দেখে শুনে নিতে হবে। যাক, চল, কাজ হয়ে গেছে। আমি কাজে ব্যস্ত থাকব। তুমি বেশি দূরে চলে যেও না। যে কোনো সময় অগ্ন্যুৎপাত হতে পারে।

পোশাক পরে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে মহাকাশযানের 'এয়ার লক' খুলে আমরা বাইরে পা রাখলাম। মাধ্যাকর্ষণ এমন কিছু অসুবিধেজনক নয়। চাঁদের মতোই প্রায়। আমরা অভ্যস্ত। মেয়ে প্রায় উড়েই চলল আনন্দে। প্রাণহীন অজানা অচেনা গ্রহ-উপগ্রহের বুকে পা রাখতে একটা রোমাঞ্চ—একটা আনন্দ হয় তা জানি। তাই মেয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে মহাকাশচারীর পোশাকের সঙ্গে লাগানো বেতারযন্ত্রের সাহায্যে বললাম, মামণি, দুষ্টুমি করবে না। বেশি দূরে যাবে না।

বেতারের সাহায্যে মেয়ে বলল, ঠিক আছে বাবা। তুমি কাজ কর। আমি আমার ডায়েরির উপাদান সংগ্রহ করি। একে মহাকাশচারীর পোশাক তাতে বাতাস নেই। ফলে সাধারণভাবে কথা বলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না এখানে।

লাভার তৈরি পাহাড়-পর্বত। ৪৬০ কোটি বছর আগে সৌরজগত সৃষ্টি হয়েছিল—আর তার কিছু পরে যে উল্কাপাতের ঝড় বয়ে গিয়েছিল নবগ্রহ আর তার উপগ্রহদের ওপর—সেই উল্কাপাতের ক্ষতচিহ্নগুলোকে আজও স্মৃতির মতোই বুকে ধরে রেখেছে আই.ও.।

কাজ করতে করতে আমার সময়ের জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ পায়ের তলাকার মাটি সজোরে কেঁপে উঠতে আমি সচেতন হলাম। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি এক মাইল দূরের আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত শুরু হয়েছে। ভয়ংকর সুন্দর সেই দৃশ্য। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ আমার মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল। এদিক ওদিকে তাকিয়ে মেয়েকে খোঁজার চেষ্টা করে বার্থ হলাম। আশে পাশের উঁচু উঁচু পাহাড়ে বাধা পাবার ফলে বেতারযন্ত্রও ঠিক কাজ করছে না। আমার ভীষণ ভয় হলো। কোথায় গেল মেয়েটা!

মাটির ওপর ভাল করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না। বেশ জোরে ভূমিকম্প হচ্ছে। আশংকা হলো মাটি না ফাঁক হয়ে যায়। সেরকম একটা সম্ভাবনার কথা মনে হতেই আমার সারা দেহে যেন আতংকের একটা কম্পন জাগল। রাগ হলো মেয়ের উপর। বার বার বারণ করলাম বেশি দূরে যাবি না।

হঠাৎ আমার যেন মনে হলো, মেয়ে আমাকে ডাকছে। বাবা, আমি সামনের পাহাড়টার আড়ালে। মাটি ভয়ানক জোরে কাঁপছে। উঠে দাঁড়াতে পারছি না।

বেতারযন্ত্রে বললাম, চুপচাপ বসে বা শুয়ে থাক। ওঠবার চেষ্টা করিস না। আমি যাচ্ছি।

মেয়েকে নড়াচড়া করতে নিষেধ করলাম। কারণ, যদি নড়ে যাবার ফলে কোনো পাথরে ধাক্কা লেগে মহাকাশচারীর পোশাকটায় যদি কোনো রকমে 'লিক' হয়ে যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটবে। আর সে মৃত্যু হবে ভয়ংকর।

কোনোরকমে হামাগুড়ি দিয়ে সামনের পাহাড়টার পেছনে গিয়ে পৌঁছতেই দেখি, মেয়ে একটা পাথরে হেলান দিয়ে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের দৃশ্য দেখছে একমনে। তারপর বেতারে আমার ডাক শুনতে পেতেই ফিরে তাকাল দেবিকা।—কী সুন্দর বাবা!

আমি বললাম, সুন্দর শুধু নয়। ভয়ানক। ঐ দেখ জ্বলন্ত পাথরগুলো এতদূর পর্যন্ত ছিটকিয়ে আসছে। চল মহাকাশযানে উঠে পড়ি।

ব্যাপারটা সত্যিই বিপদজনক। মহাকাশযানটাকে নামাবার সময় এতদূর পর্যন্ত যে পাথর ছিটকিয়ে আসতে পারে তা অনুমান করতে পারি নি। রাশি রাশি জ্বলন্ত পাথর আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে মহাশূন্যের দিকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তারই দু একটা এতদূর পর্যন্ত এসে পড়ছে।

মহাকাশযানে ফেরবার পথে পাথরবৃষ্টির মাত্রা আরও যেন বেড়ে গেল। শুধু তাই না। প্রাণ নিয়ে কোনোরকমে মহাকাশযানের ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কয়েকটা পাথর মহাকাশযানের ওপর পড়ে জাহাজটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেবিকা বলল, বাবা, জাহাজটার কোনো ক্ষতি হয় নি তো। ওর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

আমি একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললাম, কে জানে। এইসব ঝামেলার জন্যেই তো তোকে আনতে চাই নি। এখন অপেক্ষা করি। পাথরবৃষ্টি থামলে দেখতে হবে।

আই. ওর বুকে নামার সময় আমি আর কণ্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করি নি। ভাবলাম, যখন নিরুপায় হয়ে বসেই আছি তখন কণ্ট্রোলকে আমাদের অবস্থান আর কি ঘটছে তা জানিয়ে রাখা ভাল। পাথরবৃষ্টির ফলে উড়ে অন্য কোথাও সরে যাওয়াও এখন যাবে না। এমনিতেই মাঝে মধ্যে বড় বড় পাথরের চাঁই এসে পড়ছে জাহাজটার ওপর। ওড়বার সময় সংঘাত হলে তা মারাত্মক হবে।

মঙ্গলের কণ্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়েই আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। কিছুতেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। অথচ মনে হচ্ছে যন্ত্রটা ঠিকই কাজ করছে। অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে পাথরবৃষ্টি থামবার অপেক্ষায় বসে রইলাম। এরই

টি.ভির পর্দায় আগ্নেয়গিরির ছবি সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে

মধ্যে লক্ষ্য করলাম যে মেয়ে মহা উৎসাহে তার ডায়েরি লিখে চলেছে। কন্ট্রোল রুমের দেওয়াল জোড়া টি.ভি.র পর্দায় আগ্নেয়গিরিটার ছবি সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে। দেবিকা সেদিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে আর লিখছে।

সমস্ত উৎকণ্ঠা দূর করে পাথরবৃষ্টি থেমে গেল বেশ কয়েক ঘণ্টার পর। আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে এখন কেবল আগুন আর ছাই বেরুচ্ছে। কি ভয়ংকর সুন্দর সেই আগুন। লাল-নীল-হলদে-সবুজ বিচিত্র সব বর্ণ। আগুনের যে এত রূপ হয় তা না দেখলে বিশ্বাস করা কষ্ট হতো।

'এয়ার লক' খুলে আমি বাইরে বেরুলাম। দেবিকারও ডায়েরি লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে এল।

যে সর্বনাশের আশংকা করছিলাম, বেরিয়ে দেখি ঠিক তাই। 'এনটেনা'টা ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে গেছে। মেয়েকে কিছু না বললেও একটা অজানা ভয়ে কেঁপে উঠলাম। ফিরব কেমন করে? কন্ট্রোলের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে ফেরা অসম্ভব। ধাক্কাটা সামলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম অন্য কি ক্ষতি হয়েছে। এটা সেটা পরীক্ষা করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখলাম আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত আমাদের এক চরমতম সর্বনাশ করেছে। শক্তি উৎপাদনকারী যন্ত্রটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর অর্থ আমাদের ব্যাটারিগুলো সামান্য কয়েকদিনের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে গেলে আর বিদ্যুৎ থাকবে না। তার মানে টি. ভি. রেডার, আলো, আর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সেই অক্সিজেন তৈরির যন্ত্রটাও বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা তিলে তিলে দমবন্ধ হয়ে সবাইয়ের চোখের অগোচরে মারা পড়ব। সাহায্যের আশা সুদূরপরাহত। কন্ট্রোল জানেই না আমরা কোনখানটায়। তা ছাড়া সাহায্য না চাইলে নিজের থেকে ওদের খোঁজখবর শুরু করার অনেক অনেক দেরি হয়ে যাবে। ততদিনে আমাদের মৃতদেহ আই.ও.র বুকে পড়ে থাকবে।

নিজের মৃত্যুর জন্যে আমি ভয় পাই না। দুঃখ আমার মেয়েটার জন্যে। কত স্বপ্ন ওর চোখে। সব ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর কোনোদিনই ও পৃথিবীতে মায়ের কাছে ফিরে যেতে পারবে না। কেন যে ওকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে আবার বাড়ি ফিরে গিয়ে নিয়ে এলাম!

দেবিকা আমায় লক্ষ্য করছিল। সে হঠাৎ বলল, বাবা...।আমি বললাম,ভেতরে চল। সব বলছি।

মেয়েকে লুকিয়ে রাখার কোনো অর্থ হয় না। তাই কন্ট্রোল রুমে ফিরে এসে আমি সব ক্ষয়-ক্ষতির কথা খুলে বললাম–এসব মেরামতি করা আমার একার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার সহকর্মী পাণ্ডে থাকলেও না হয় কথা ছিল। এর অর্থ আমাদের

নিশ্চিত মৃত্যু। অক্সিজেন ফুরোলেই আমরা মরব।

ভেবেছিলাম সব শুনে মেয়ে হয়তো ভয়ে আঁতকে উঠবে। কিন্তু মেয়ের সাহস দেখে অবাক হলাম। ও একটুও ভয় পায় নি। সে বলল, বাবা ভেঙে পড়ছ কেন? কোনো উপায় কি নেই? অন্ততঃ এ্যানটেনাটা কি সারানো যাবে না?

—না।

—সাহায্য এসে পড়ার কি কোনো সম্ভাবনা নেই?

—আছে। তবে ততদিনে আমরা মরে যাব। ওরা জানবে কি করে—আমরা কি বিপদে পড়েছি? দিন দশের পরে ওরা রুটিনমাফিক খোঁজ-খবর করবে।

—হুঁ। দেবিকা একটু গুম হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। তারপর হঠাৎ সে প্রশ্ন করল, বাবা, শুনেছি আগেকার মানুষেরা বিপদে পড়লে 'ভগবান' বলে কাউকে ডাকতো। 'ভগবান' কে বাবা?

—জানি না মা। শুনেছি এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টিকর্তা। একমনে ডাকলে নাকি তিনি সাড়া দেন। ছুটে আসেন।

—আমরাও যদি ডাকি?

—জানি না মা, তিনি সত্যই আছেন কি না আর ও ভাবে ডাকলে হবে কি না? শুনেছি আগেকার মুনিঋষি বলে এক শ্রেণীর মানুষ এর জন্যে দীর্ঘদিনের তপস্যা করে শক্তি অর্জন করতেন। আমরা ভগবান বলতে বুঝি ভিন্ন গ্রহবাসী কোনো উন্নত সভ্যতার লোকদের। তাদের সঙ্গে আমাদের এখনও ঠিক যোগাযোগ হয় নি—যদিও সম্ভাবনা দিন দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

—বেশ, তা না হয় হলো। কিন্তু মঙ্গল কন্ট্রোলকে কি কোনো রকমে ডাকা যায় না?

—বেতার ছাড়া কি করে ডাকবি? বলে আমি হতাশ হয়ে থামলাম। তারপরই হঠাৎ আমার একটা কথা মনে এল।

—আচ্ছা মা, ভূমিকম্পের সময় তুই যে পাহাড়ের আড়ালে আছিস—তা আমায় জানালি কি করে? বেতারে?

—বা-বা। আমি বোকা নাকি? আমি কি জানি না যে ঐ পাহাড় ঘেরা জায়গাটা থেকে আমাদের মহাকাশচারীর পোশাকের সঙ্গে লাগানো বেতার যন্ত্রের কমজোরী তরঙ্গ কিছুতেই ওপারে তোমার কানে যেতে পারবে না।

—তবে যে আমি স্পষ্ট শুনলাম...বিস্মিত হয়ে আমি প্রশ্ন করলাম।

—কি জানি, তবে আমি মনে মনে তোমার সঙ্গে কথা বলছিলাম, ভাবছিলাম তুমি নিশ্চয় চিন্তা করছ আমায় দেখতে না পেয়ে।

আমার ভেতরে একটা দারুণ উত্তেজনা হচ্ছিল। তা দেখতে পেয়ে মেয়ে প্রশ্ন করল, কি হলো তোমার বাবা? শরীর খারাপ?

—না। না। ওকে থামিয়ে দিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা, আমি যখন পৃথিবীর মহাকাশ বন্দরে, তখনও কি তুই আমার সঙ্গে মনে মনে কথা বলছিলি?

—বাঃ! বলব না! আমার কি কান্না পাচ্ছিল। বালিশে মুখ গুঁজে খালি বলছিলাম, বাবা, আমায় নিয়ে যাও।

এবার আমার শেষ প্রশ্ন। উত্তেজনা চাপবার আপ্রাণ চেষ্টা করে প্রশ্ন করলাম, আচ্ছা বল তো মা, আমি যে তোকে নিয়ে যেতে আসছি—তা কি তুই বুঝতে পেরেছিলি? এখানে পাহাড়ের পাশে যখন বসেছিলি – তখনও কি তুই বুঝতে পেরেছিলি আমি আসছি?

—কেন পারব না? এ আমি সব সময় পারি। দেখলে না, তুমি যখন বাড়ি ফিরে এলে—আমি প্রস্তুত হয়ে ছিলাম। আমি যে বুঝতে পেরেছিলাম, তুমি আমায় নিতে আসছ।

আমার আর কোনো সন্দেহ রইল না যে মেয়ে আমার প্রচন্ড টেলিপ্যাথি শক্তির অধিকারী। বললাম তুই টেলিপ্যাথি জানিস। তোর জন্মগত শক্তি এটা।

—টেলিপ্যাথি কি বাবা?

—চিন্তা-তরঙ্গ। আমাদের চিন্তাগুলোও বেতার তরঙ্গের মতো ছড়িয়ে পড়ে। যাদের এ শক্তি আছে বা যারা অর্জন করেছে তারা বেতার যন্ত্র ছাড়াও অন্য লোকের সঙ্গে কথা বলতে পারে। আগেকার মুনি-ঋষিদের সম্ভবত এই ক্ষমতাটা ছিল। তুই একমনে মঙ্গল কন্ট্রোলের 'রাও'কে ডাক তো মা, দেখ, সে সাড়া দেয় কি না।

—এই ব্যাপার? আচ্ছা আমি চেষ্টা করছি বাবা। বলে দেবিকা চেয়ারে চোখ বুঁজে বসে পড়ল।

আমি উৎকণ্ঠা নিয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে বসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। মেয়ের মুখে নানান রকমের ভাব ফুটে উঠে মিলিয়ে যেতে থাকল। সময় বয়ে চলল তিল তিল করে...পনের মিনিট...কুড়ি...তিরিশ। এক ঘণ্টা...এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিট...। মেয়ে বুঝেছে এ মরণ বাঁচন খেলা। বুঝতে পারছিলাম ওর ভীষণ শারীরিক কষ্ট হচ্ছে। মুখে যন্ত্রণার ছাপ পড়ছে। তবু আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম...।

এক ঘণ্টা পঞ্চান্ন মিনিট পরে ক্লান্তির হাসি হেসে মেয়ে চোখ মেলল।

—কি হলো মা?

—আসছে। সাহায্য আসছে বাবা, শনির কাছাকাছি একটা মহাকাশযান রয়েছে। রাও কাকু তাকে নির্দেশ দিলেন। আর একটুও চিন্তা করবে না বাবা। চল, একটু ঘুমিয়ে নিই আমরা ততক্ষণে।

—হ্যাঁ। তাই চল মা। চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে ভাবলাম, ভাগ্যিস মেয়েটাকে সঙ্গে করে এনেছিলাম!

ছবিঃ সুবোধ দাশগুপ্ত

আস্ত বোকা

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়

অনেকদিন আগের কথা । এক গ্রামে দুই ভাই বাস করতো। বাবার মৃত্যুর পরে তারা দুভাই সমান সমান জমি পেয়েছিল। ছোট ভাই তার জমিতে বিশেষ কিছুই করতো না; কিন্তু তার জমিতে খুব ভাল ফসল হতো। বড় ভাই তার জমিতে ফসল ফলাবার জন্য খুব পরিশ্রম করতো ; কিন্তু তার জমিতে ফসল ভাল হতো না। কিছুদিন পরে বড় ভাইয়ের মনে হলো যে ছোট ভাইয়ের জমিটি নিশ্চয়ই খুব ভাল এবং বেশি উর্বর, তাই ওই জমিতে ফসল অত ভাল হয়। তখন সে ছোট ভাইকে বলল–তোমাতে আমাতে আমাদের জমি বদলাবদলি করে দেখি। ছোট ভাই সানন্দে রাজী হলো ; কিন্তু তাতেও বিশেষ সুবিধে হলো না। ছোট ভাইয়ের জমিতে প্রচুর ফসল হলো ; বড় ভাইয়ের জমিতে বিশেষ কিছুই হলো না।

বড় ভাই কিছুতেই বুঝতে পারছিল না, কী করে এরকম হতে পারে। একদিন সে ঠিক করলো রাত্রে ছোট ভাইয়ের গোলা থেকে কিছু শস্য বীজ নিয়ে এসে তার জমিতে ছড়িয়ে দেবে।

সন্ধ্যার পর অন্ধকার হয়ে এলে সে ওই জায়গায় গিয়ে পৌছল। গাধাটিকে এক জায়গায় বেঁধে রাখলো। যে থলিতে সে শস্যবীজ ভরে নেবে বলে এনেছিল, যেই তার মুখটি খুললো, ঠিক তখনি তার সামনে অচেনা একটি লোক এসে হাজির হলো। সে জিজ্ঞাসা করলো–তুমি এখানে কী করছো ?

বড় ভাই বললো–আমিই তোমাকে একথা জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কে ?

অচেনা লোকটি উত্তর দিল–আমি তোমার ভাইয়ের ভাগ্য। আমার কর্তব্য হলো তার শস্য পাহারা দেওয়া, যাতে কেউ তা চুরি করতে না পারে।

বড় ভাই বললো–ওঃ, তুমিই আমার ভাইয়ের ভাগ্য। আচ্ছা, তুমি কি বলতে পার আমার ভাগ্য কোথায় ?

অচেনা লোকটি উত্তর দিল–তোমার ভাগ্য অনেক দূরে এক পাহাড়ের ওপরে বসে আছে। এই বলে সে বুঝিয়ে দিল, কী করে কোন দিক দিয়ে সেখানে পৌছান যায়। সে আরও বললো–তুমি যদি সৌভাগ্যের অধিকারী হতে চাও, তাহলে তোমার ভাগ্যকে খুঁজে বার করে তাকে ঘুম থেকে তুলে জাগিয়ে দিতে হবে।

বড় ভাই এই কথা শুনে ভাবলো–এবার তাহলে তার ভাগ্য ফিরবে। সে তার ছোট ভাইয়ের হাতে জমির দেখাশোনার ভার দিয়ে, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর গুছিয়ে নিয়ে রওনা হলো।

বেশ কিছু দূরে চলে গিয়ে তারপর সে এক ভয়ংকর সিংহ দেখতে পেলো। সিংহ তার দিকেই এগিয়ে আসছিল, যেন তাকে খেয়ে ফেলতে আসছে। বড় ভাই হাঁটু গেড়ে বসে খুব অনুনয় করে সিংহকে বললো–আমাকে তুমি ছেড়ে দাও, আমি যেখানে যাচ্ছি নিরাপদে সেখানে আমাকে যেতে দাও।

সিংহ বললো–আমি তোমাকে ছেড়ে দেব, যদি তুমি আমাকে ঠিক করে বলো কোথায় তুমি যাচ্ছ, কী করতে যাচ্ছ।

বড় ভাই তখন সিংহকে জানালো যে সে তার ভাগ্যকে খুঁজে বার করে তাকে জাগাতে যাচ্ছে।

সিংহ বললো–আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। তুমি তোমার ভাগ্যকে খুঁজে বার করে জাগাবার পর আমার হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করো, আমি যতই খাই, কিছুতেই আমার তৃপ্তি হয় না। এরকম কেন হয় এবং কী করলে রোগ সারবে।

বড় ভাই বললো–আমি জিজ্ঞাসা করে নেব।

আবার সে এগিয়ে চলতে আরম্ভ করলো। কিছুদূর গিয়ে সে এক গ্রামে পৌঁছলো। সেখানে এক বৃদ্ধ কৃষকের সঙ্গে দেখা হলো। তার কাছেই সে রাত্তিরে থাকার আশ্রয় পেলো। কৃষকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে তাকে সব কথা জানালো। বললো যে সে তার ভাগ্যকে খুঁজে তাকে জাগাতে যাচ্ছে।

কৃষক বললো–ভাগ্যকে খুঁজে পেয়ে তাকে জাগাবার পর তুমি আমার হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করো, আমার যে একখন্ড জমি আছে, আমার যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও তাতে কিছুতেই ভাল ফসল ফলাতে পারছি না কেন?

বড় ভাই তাকেও আশ্বাস দিয়ে এগিয়ে চললো ভাগ্যের সন্ধানে। অনেকদূর যাবার পর সে এক শহরে পৌঁছলো। শহরের নিয়ম অনুযায়ী তাকে সঙ্গে সঙ্গে রাজার কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন–কী কাজে তুমি এখানে এসেছ? সে আবার তার সব কথা রাজাকে জানালো। রাজা সব শুনে বললেন–তোমার ভাগ্যকে খুঁজে পেয়ে জাগাবার পর আমার হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করো আমি আমার দেশের লোকজনদের জন্য এত চেষ্টা করছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার রাজ্যের যেরকম উন্নতি হওয়া উচিত, সেরকম কেন হচ্ছে না?

বড় ভাই রাজার কথায় রাজী হয়ে শহর ছেড়ে আরও এগিয়ে চললো। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়টি দেখতে পাওয়া গেল। সে পাহাড়ের কাছে পৌঁছে ওপরে উঠতে আরম্ভ করলো। ওপরে পৌঁছে দেখলো সুন্দর পোশাক পরা একজন বেশ স্বাস্থ্যবান লোক খুব জোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। সে তার কাছে গিয়ে ডাকাডাকি করতে লাগলো–ওঠ ওঠ, তুমি কি সব সময় ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেবে?

লোকটি জেগে উঠে দুহাত দিয়ে চোখ রগড়াতে লাগলো, তারপর বেশ জোরে হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বললো–আঃ! এবার আমি জেগে উঠেছি। আমি আর ঘুমোবো না। তুমি চিন্তা করো না।

লোকটি ভালভাবে জেগে উঠে বসার পর বড় ভাই তাকে একে একে সিংহের, কৃষকের এবং রাজার প্রশ্নগুলির উত্তর জিজ্ঞাসা করলো। প্রশ্নগুলির উত্তর সে জেনে আসবে সকলকেই কথা দিয়েছিল। উত্তরগুলি শুনে সে আবার ফেরার জন্য রওনা হলো।

প্রথমে সে শহরে পৌঁছলো। আবার তাকে রাজার কাছে হাজির করা হলো।

এবার আমি জেগে উঠেছি

রাজা তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন– কী? ভাগ্যকে খুঁজে বার করতে পেরেছ? তাঁকে জাগিয়েছ? আমার প্রশ্নের উত্তর জেনে এসেছ?

খুব খুশি মনে সে উত্তর দিল–হ্যাঁ, আমি তাঁকে জাগিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি।

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন–তিনি কী বললেন?

–আমি গোপনে আপনাকে বলব। সকলের সামনে বলব না।

রাজা তখন সকলকে রাজসভা ত্যাগ করে যেতে বললেন। সকলে চলে গেলে বড় ভাই রাজাকে জানালো–আমার ভাগ্য বললেন যে রাজাধিরাজ, আপনি আসলে একটি মহিলা, আর মহিলার শাসনে রাজ্যের উন্নতি হয় না।

রাজা এই শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এবং তাকে অনুরোধ করলেন কাউকে যেন কখনও একথা না বলে। তিনি তাকে আরও বললেন–কিন্তু, তুমি যখন এটা জেনে গেছ তখন আমার জায়গায় তুমিই রাজা হও এবং আমাকে বিয়ে কর।

বড় ভাই চেঁচিয়ে উঠল–না না। তা কী হয়? আমাকে আমার জমিতে ফিরে যেতে হবে। এখন যখন আমার ভাগ্য জেগে উঠেছে এবার আমি আশা করি আমার দুঃখ-কষ্টের অবসান হবে। আমার জমিতে পরের ফসল যে দ্বিগুণ হবে তাতে আমার সন্দেহ নেই।

প্রকাশিত হয়েছে

কর্মশিক্ষা আর বিজ্ঞান প্রদর্শনীর মডেল তৈরীর একমাত্র বই গঙ্গেশ ঘোষ ও মদন মুখোপাধ্যায়ের

হাতে কলমে (১ম)

দাম মাত্র নয় টাকা।

সহজ সরল ভাষায় লেখা চোখ-ধাঁধানো মন-মাতানো দশ-দশটা মডেল বোঝানো আছে অসংখ্য ছবিতে। প্রত্যেক পাতায় মজা। শুধু তৈরীই নয় পড়েও সমান মজা।

নিউ বেঙ্গল প্রেস

৬৮, কলেজ স্ট্রীট : কলকাতা-৭০০০৭৩

রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন কতটা জমি তার আছে। তারপর তাকে তার জমির দামের চেয়ে অনেকগুণ বেশি দামের সম্পত্তি দিতে চাইলেন; কিন্তু বড় ভাই কোনো কথাই শুনলো না। সে আবার ফেরার পথে রওনা হলো।

যে গ্রামে কৃষকের বাড়িতে সে আশ্রয় পেয়েছিল, সেখানে গিয়ে পৌঁছল। কৃষক তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলো এবং জিজ্ঞাসা করলো–তুমি কি ভাগ্যকে খুঁজে পেয়ে তাকে জাগাতে পেরেছো?

বড় ভাই উত্তর দিল–হ্যাঁ।

কৃষক জিজ্ঞাসা করলো–আমার প্রশ্নের কী উত্তর পেলে?

বড় ভাই বললো–তিনি বললেন যে কিছু জমিতে যে ভাল ফসল হয় না তার কারণ হলো ওই জমির নিচে অনেক ধন-সম্পদ পোঁতা আছে। তুমি যদি মাটি খুঁড়ে ওই ধন-সম্পদ বার করে নাও, তাহলে ওই জমিতেই আবার ভাল ফসল হবে।

এই কথা শুনে কৃষক কোদাল আনল। বড় ভাইকে সঙ্গে নিয়ে সেই জমিতে গেল। দুজনে মিলে মাটি খুঁড়তে লাগলো। কিছুক্ষণ পরেই তারা সোনাভর্তি সাতটি কলসী দেখতে পেলো।

কৃষক তখন বললো–বন্ধু, আমার তো অনেক বয়স হলো, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। তুমি আমার সঙ্গেই থাক, আমার মেয়েকে বিয়ে কর। এই জমি এবং ধনসম্পদ সব তোমার হবে।

বড় ভাই উত্তরে বললো–না না তা কী হয়? আমাকে আমার জমিতে ফিরে যেতে হবে। আমার ভাগ্য এখন জেগেছে, আমার ফসল এবার নিশ্চয় দ্বিগুণ হবে এবং আমার দুঃখ-কষ্ট ঘুচবে।

বৃদ্ধ কৃষক তাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলো; কিন্তু সে তার মন স্থির করে ফেলেছিল। তাই আর অপেক্ষা না করে আবার রওনা হলো।

তারপরে তার সিংহর সঙ্গে দেখা হলো। সিংহ খবরাখবর জিজ্ঞাসা করলো। এতক্ষণ যা যা হয়েছে সিংহকে সেসব কথা বললো ও। সিংহ তখন জিজ্ঞাসা করলো–তোমার ভাগ্য আমার প্রশ্নের উত্তরে কী বললেন?

বড় ভাই বললো–তিনি বলে দিয়েছেন যে তোমার সমস্যার নিশ্চয়ই একটি প্রতিবিধান আছে।

সিংহ ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করলো–সেটা কী তাই বল। আমি অপেক্ষা করতে পারছি না।

বড় ভাই বললো–আমার ভাগ্য বলেছেন যে যখনই তুমি এমন একজন লোককে দেখবে, যে আস্ত বোকা, তখন তুমি তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে গবগব করে গিলে খাবে।

সিংহ এই কথা শুনে একটু থেমে চিন্তা করে নিল। তারপর বললো–দেখ বাপু, আমার জীবনে আমি তোমার মতো এমন একটি আস্ত বোকা আর দেখিনি।

বড় ভাই-এর জীবন এখানেই শেষ হলো।

ছবি : সরোজ সরকার

কেষ্ট বিষ্টু এবং তোতাপাখি

জীবন ভৌমিক

বিষ্টুবাবুর ছেলের নাম কেষ্ট। লোকে বলে বাপ-বেটায় ভাই ভাই। ওরা দুজন একসংগে রাস্তায় চললে লোকে বলে কেষ্ট বিষ্টু যাচ্ছে। বিষ্টুবাবু এখন কেউ-না-কেটা কেষ্ট বিষ্টুই হয়েছে। নিজের মোটা মাইনের চাকরি। একমাত্র ছেলে শ্রীকৃষ্ণচরণ, ওরফে কেষ্ট চার বারের বার উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করল। আর পাশ করতে না করতেই চাকরি। হাজার হাজার ছেলে যখন চাকরির পেছনে চরকির মতো ঘুরছে তখন চাকরি যেন কেষ্টর জন্য ওৎ পেতে বসেছিল। পাশ করতে না করতেই ধরল তাকে খপ্ করে। বাবার কারখানাতেই চাকরি পেয়ে গেল সে। মর্নিং ডিউটি।

পেলে হবে কী! কেষ্ট চাকরি করবে কী করে! কারখানার চাকরি। ভোর ছটায় ডিউটি। বাড়ি থেকে বেরুতে হবে পাঁচটায়। তার মানে ঘুম থেকে উঠতে হবে ভোর চারটেয়। হয়ে গেল! ঐখানেই কেষ্ট কাৎ। ভোর চারটেয় কেষ্টর বাবা কোনওদিন ঘুম থেকে উঠতে পারেনি, কেষ্ট তো কোন ছাড়!

কিন্তু ছাড় বললেই তো কেউ ছাড়বে না। ডিউটি ইজ ডিউটি। ভোর ছটার মধ্যে কারখানাতে ঢুকে কার্ড পাঞ্চ করাতে না পারলে চাকরি নট। কেষ্টর বাবা বিষ্টু তাই সাত দিন আগে থেকে ছেলের ঘুম ভাঙাবার রিহার্সাল দিতে শুরু করল। কুম্ভকর্ণ তবু টানা ছ'মাস ঘুমিয়ে উঠে পড়েছিল। কিন্তু কেষ্টচরণের ঘুম তা নয়। বেলা নটার সময় নৈর্ঋত কোণের তেরছা রোদ বিছানা তাতিয়ে না দিলে তার ঘুম ভাঙে না। টেনে হিঁচড়ে তুলে দিলেও আড়মোড়া ভেঙে আবার শুয়ে পড়ে। ঐ ঘুমের জন্যই পরীক্ষায় ডিগবাজি খাবার হ্যাট্রিক করেছিল কেষ্টচরণ।

যাই হোক প্রথমদিন ঘরের টেবিল ক্লকটায় কষে এ্যালার্ম দিয়ে ছেলের মাথার কাছে রেখেছিল বিষ্টুবাবু। বেলা সাতটায় ঘুম থেকে উঠে বিষ্টুবাবু দেখল তার ছেলে কেষ্ট নাক ডাকিয়ে নিদ্রামগ্ন।

কী হলোরে। কানের কাছে এ্যালার্ম বাজল টানা দেড় মিনিট, শুনতে পেলি নে!

টানা দেড় মিনিট বাজেনি বাবা! বাজনা শুরু হতেই হাত দিয়ে চেপে দিয়েছি।—শুয়ে শুয়েই জবাব দেয় কেষ্ট।

ছেলের চুলের ঝুঁটি ধরে টান মেরে বিষ্টুবাবু বলে—ওঠ বজ্জাত ছেলে, ওঠার অব্যেস কর।

আ-আ করে কেষ্ট উঠে পড়ে। বাপ ভাবে এটাই মোক্ষম দাওয়াই। কিন্তু ভোর চারটেয় উঠে ছেলের চুলের ঝুঁটি টানবে কে! বিষ্টুবাবুর নিজের ঘুমই তো তখন ভাঙে না।

এ্যালার্ম দেওয়া ঘড়িটা পরের দিন নিজের ঘরে রাখল বিষ্টুবাবু। একদম কানের কাছে। বাজল ভোর চারটেয়। বেজেই চলল। বিষ্টুবাবু উঠল না। তো এই কেষ্ট বিষ্টুর ঘুমই হয়ে উঠল সমস্যা।

কিন্তু সমস্যা থাকলে তো চলবে না। তার সমাধান চাই। সেই সমাধানের কথা ভাবতে ভাবতেই বিষ্টুবাবু সেদিন বাজারে গিয়েছিল। বাজারে গিয়ে দেখতে পেল এক পাখিওলার কাছে এক আজব তোতাপাখি। হরিনাম করা বা আদর-আপ্যায়ন করার ভাষা নেই তোতাপাখিটার মুখে। তার মুখে খালি গালাগাল—যেমন, পাজি নচ্ছার, হতচ্ছাড়া, তুই বেটো বদমাশ। শুনে কানে আঙুল দেয় বিষ্টুবাবু। চলে যাচ্ছিল সেখান থেকে। গালাগাল একদম সইতে পারে না বিষ্টুবাবু। ঘুমের মধ্যেও গালাগাল কানে ঢুকলে তার গা-পিত্তি জ্বলে যায়, ঘুম চটে যায়। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ে।

ছবি দেখতে ছোটরা ভালোবাসে। রংচংয়ে ছবি হলে তো কথাই নেই। সেই দিকে নজর রেখে

দেব সাহিত্য কুটীর

একের পর এক বের করে চলেছেন অফসেটে ছাপা রংবেরংয়ের ছবিতে ভরা সব বই। ছবি দেখতে দেখতেই ছোটরা শিখে যাবে অ, আ, ক, খ, এ, বি, সি, ডি, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ আরও অনেক কিছু।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

বর্ণপরিচয়

(প্রথম ভাগ)

দাম : ৫.৫০ পয়সা মাত্র

অফসেটে ছাপা বড় আকারের নতুন বই। আগাগোড়া চার রংয়ে ছাপা অজস্র ছবিতে ভরা বর্ণপরিচয়ের নবতম সংস্করণ।

খুশির পড়া

দাম : ৬.০০ মাত্র

খুশি হয়ে পড়ার মতো বই-ই বটে। পাতায় পাতায় রংয়ের বাহার, ঝকঝকে সব ছবি ছোটদের তাক লাগিয়ে দেবে।

গুণতে মজা

দাম : ২.৫০ মাত্র

ছবি আর ছড়া দিয়ে ছোটদের যেমন গুণতে শেখানো হয়েছে তেমনি শেখানো হয়েছে যোগ, বিয়োগ করতেও। ছবি দেখে ছড়া পড়তে পড়তেই ছোটরা শিখে যাবে অংকের প্রথম পাঠ

খোকাখুকুর ABC

দাম : ২.৫০ মাত্র

বাংলার সাহায্যে ইংরাজি শেখানোর বই আর বোধহয় নেই। রংচংয়ে ছবি দেখতে দেখতেই ছোটরা শিখে যাবে ইংরাজি অক্ষরমালা।

আদর্শ লিপি ও সহজ বর্ণপরিচয়

দাম : ৬.০০ মাত্র

ছোটদের বর্ণপরিচয়ের এক মজাদার বই। একটি বইয়েই বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি আর উর্দু বর্ণমালা শেখার সুযোগ রয়েছে।

ছবিতে ভারতের ইতিহাস

দাম : ২.৫০ পয়সা মাত্র

দেশের কথা জেনে ছোটরা যাতে বড় হতে পারে সেইজন্যেই চার রংয়ে ছেপে নাম মাত্র দামে বার করা হয়েছে এই বইটি।

ছোটদের চিড়িয়াখানা	আগড়ুম বাগড়ুম	ইকড়ি মিকড়ি
দাম : ২.৫০ পয়সা মাত্র	দাম : ২.৫০ মাত্র	দাম : ২.৫০ মাত্র

ছবিতে ভরা ছোটদের ভালো লাগার মতো দারুণ তিনটি ছড়ার বই। হাতে পেলে ছোটরা এর একটিও ছাড়তে চাইবে না।

দেব সাহিত্য কুটীর ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা–৯

বিষ্টুবাবু সেই পাখিওলার কাছে ফিরে এল।

–বলি হ্যাঁগো পাখিওলা! তোমার এই পাখি আরও গালাগাল জানে?

–নিশ্চয়ই বাবু। যত রাগবে, তত বুলি বের হবে। এমনিতে শান্তশিষ্ট। মুখে রা নেই। কিন্তু রাগিয়ে দিলে ভূত ছুটিয়ে দেবে।

–বাঃ বাঃ! তা এর দাম কত?

–পঁচিশ টাকা।

বিশ টাকায় রফা করে বিষ্টুবাবু সেই আজব তোতাপাখি কিনে আনল খাঁচাসুদ্ধু।

বাড়িতে এনে পাখি সমেত খাঁচাখানা ঝুলিয়ে রাখল তার শোবার ঘরে।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করে–কী বাবা, হঠাৎ তুমি বাজার থেকে তোতাপাখি কিনে আনলে যে বড়! পাখি পোষার শখ হলো আবার কবে থেকে?

–দায়ে পড়লে সবই করতে হয় রে!

–তোমার আবার নতুন কী দায় পড়ল?

–তোর ঘুম ভাঙানোর দায়। ভোর চারটেয় উঠতে না পারলে তুই চাকরিতে যাবি কী করে? পরশু থেকে তো তোর কাজ চালু। হুঁশ আছে?

–হুঁশ আছে!

এটা কার গলা! পাখিটা আবার বলল–হুঁশ আছে! কেষ্ট-বিষ্টু হতবাক হয়ে পাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

কেষ্ট জিজ্ঞেস করল–তা এই পাখিটার সঙ্গে আমার ঘুম ভাঙার সম্পর্ক কী?

–আছে আছে। আসলে পাখির সঙ্গে আমার ঘুম ভাঙার সম্পর্ক আর আমার সঙ্গে তোর ঘুম ভাঙার সম্পর্ক। মনে নেই, গত পরশু বেলা সাতটায় তোর চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে তোর ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছিলুম। আমার নাম বিষ্টু।

কেষ্ট বলল–সে তো বেলা সাতটায়। আমার তো ভোর চারটেতে ঘুম ভাঙানোর দরকার। তুমি ভোর চারটে কাকে বলে জান! সেদিন তো ঘড়ির এ্যালার্মও কানে যায়নি তোমার।

পাখির খাঁচার বাটিতে ছোলা আর জল রাখতে রাখতে বিষ্টুবাবু বলে–এবার থেকে ভোর চারটেতেই তোর চুলে টান পড়বে। ভোর চারটেতেই আমি উঠব।

কেষ্ট যেদিন প্রথম কারখানায় ডিউটিতে যাবে তার আগের রাতে বিষ্টুবাবু ঘড়িতে বেশ করে এ্যালার্ম দিয়ে ঘড়িটাকে পাখির খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে খাঁচার দরজা বন্ধ করে শুতে গেল।

সারারাত ধরে ঘড়ির টিকটিক শব্দে পাখিটা বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। ভোর চারটেয় যখন হঠাৎ ঘড়ির এ্যালার্ম বেজে উঠল তখন পাখিটা দারুণ রেগে উঠল। আর রেগে গিয়েই সে গালাগাল দিতে শুরু করল। বিষ্টুবাবুর নাম ধরেই পাখিটা ভোররাতে চেঁচাতে লাগল–ওরে বেটা বিষ্টু! তোর পেটে পেটে এত বদমাইশি! ওরে বেটা উল্লুক–

গালাগাল কানে গেলে বিষ্টুবাবুর মাথার ঠিক থাকে না। পাখিটা তখনও চেঁচাচ্ছে–বেটা হাড়বজ্জাত উলুখাগড়া, সকাল বেলায় আমার পেছনে লাগা! তোর আমি ভুষ্টিনাশ করব–।

বিষ্টুবাবু তড়াক করে বিছানায় উঠে বসে। ঘরের আলো জ্বালিয়ে দেখে ঘড়িতে চারটে বেজেছে। পাখিটাকে একটু আদর করে বিষ্টুবাবু ছেলের ঘরে ঢোকে। তারপর ডাকে–কেষ্ট, ওঠ। চারটে বেজেছে। কাজে যেতে হবে রে!

কেষ্ট ওঠে না। ছেলের মাথার চুলের ঝুঁটি ধরে বিষ্টুবাবু কষে টান লাগায়। আ-আ করে কেষ্টর ঘুম ভেঙে যায়।

তোতাপাখিটা তখন বলছে–কেষ্ট ওঠ, চারটে বেজেছে।

ছবি: সরোজ সরকার

ছবির মজা

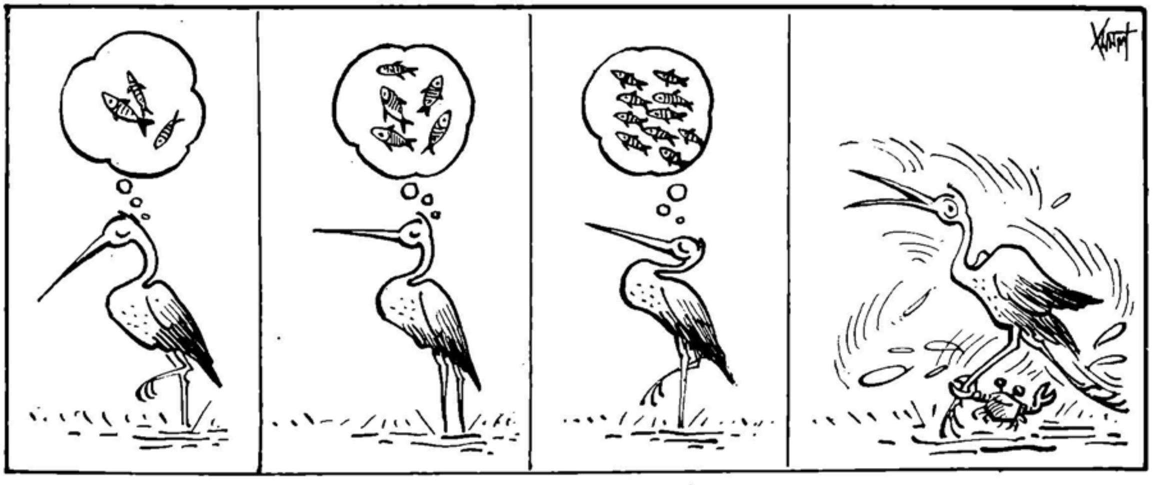

স্টার ট্রেক

রন হ্যারিস ও শ্যারমান ডিভোনো

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এসে গেলো সাটলটার কাছে...
তখন মধ্যে...
লেঃ কমান্ডার সলু বেঁচে আছে হাই কাউনসিলর। কিন্তু ওর এখনই চিকিৎসা করা দরকার!
WBL WBL WBL WBL
কিন্তু আমার যে মনে হচ্ছে বাইরে কিছু ঘোরাঘুরি করছে... শব্দ পাচ্ছি..
তখন এন্টারপ্রাইসে...
মিঃ স্পক আমি কিছুতেই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না!
আঃ ....
ক্যাপ্টেনের জ্ঞান ফিরে আসছে আস্তে আস্তে।
ফার্স্ট হাই কাউনসিলর সাটলটা কেউ যেন ভেঙে ফেলছে...
হাঁ, হাঁ...এ যে ভয়ঙ্কর এক দানব!
উউররর...
ওদিকে তখন মিমিটে কিজিনটিদের ঘাঁটিতে...
জায়েন্ট কিলারের কাছ থেকে বার্তা আসছে।
ওরা এই মুহূর্তে আমাদের কক্ষপথে ঢুকলো...
ওদিকে এন্টারপ্রাইসের ব্রিজে...
মিঃ স্পক কিজিনটিদের ঘাঁটির হদিশ আমি পেয়েছি...ওরা ওদের সাব স্পেসের সঙ্গে যোগাযোগ করছে...
উরা, যে ভাবেই হোক জায়গাটা খুঁজে বের করো, কোথা থেকে ওরা কথা বলছে...
All Rights Reserved Dist. by L.A. Times Synd.
©1982 Paramount Pictures Corp.

[চলবে]

যাদুর দেশে টারজান

সব্যসাচী

আলবুর্জের মাথায় পোকা আছে একটা। রাজা হবে সে। উপাধি নেবে সুলতান। কোন্ দেশের রাজা হবে, তাও মোটামুটি ঠিকই করে রেখেছে। অনেক দিন আফ্রিকায় আছে তো! না গিয়েছে, এমন জনপদ নেই এই অন্ধ মহাদেশে। বছর কুড়ি আগে এক জার্মান সাফারিতে মিশে উত্তর-পশ্চিমের এক পাহাড়-ঘেরা উপত্যকায় গিয়ে পড়েছিল। সেখানে ওরাই ছিল সর্বপ্রথম বহিরাগত। জঙ্গলে ভরা দেশটাতে বাসিন্দা কম। তারাও পুরোদস্তুর বর্বর, যদিও নরখাদক নয়, অতিমাত্র হিংস্রও নয়। ঘটনাচক্রে তখন তাকে দলের সঙ্গে ফিরে আসতে হয়েছিল পশ্চিম উপকূলে, কিন্তু ফিরে এসেছিল এই সংকল্প নিয়ে যে প্রথম সুযোগেই সে ঐ উপত্যকায় চলে যাবে আবার, গেড়ে বসবে সেখানকার রাজা হয়ে। বাসিন্দাদের সম্মতি? ওদিক দিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না বলে আশা তার। সাদা মানুষকে তারা দেবতা বিবেচনা করে। যে-কোনো দেবতা এসে তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে অধিষ্ঠান করলে সেটাকে তারা চূড়ান্ত বরাত-জোর মনে করবে।

এতকাল সুযোগ হয়নি সেখানে যাবার, এইবার আলবুর্জের মনে হলো সে-সুযোগ এসেছে। দু' দু'টো সাহেব তারা, দু'টো রাইফেলের মালিক। সঙ্গে আবার শ্বেতাঙ্গিনী দেবী একটি। তিনজনে মিলে সে-দেশে পৌঁছোবার অপেক্ষা শুধু। "আমরা তোমাদের শাসন করতে এসেছি বোঙ্গার আদেশে"—এইটুকুর চেয়ে বেশী পরিচয় কেউ জানতে চাইবে না তাদের।

পরিকল্পনা নিখুঁত। রীকিটা মাঝে মাঝে বিদ্রোহের সুরে কথা বলে, তা ঠিক। কিন্তু লোকটা দুর্বলচিত্ত, ওকে দাবিয়ে রাখা শক্ত হবে বলে আলবুর্জ বিবেচনা করে না। আর একান্তই যদি ও অবাধ্য হয়, পথের কাঁটা দূর করতে হয় কী করে, তা জানে আলবুর্জ। জঙ্গলে যাবে শিকার করতে। সেখানে গিয়ে একটি বুলেট খরচ—ব্যস্!

পরিকল্পনা আদ্যন্ত নিখুঁত। এইবার রওনা দেওয়া। দেরি হচ্ছে যা-কিছু, তা ঐ এমরেল্ডাকে নিয়ে। সে বশ হচ্ছে না কোনোমতে। সঙ্গে সে যাচ্ছে বটে, কিন্তু যাচ্ছে ঘোরতর অনিচ্ছায়। যত রকমে সম্ভব, সে আলবুর্জ-রীকিকে ক্রমাগত সমঝিয়ে দিচ্ছে যে সে ওদের আন্তরিক ঘৃণা করে। সবুজমণি? আলবুর্জ-রীকির সব আশাভরসা এক লাথিতে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে এমরেল্ডা। প্রথম দিনই বলে দিয়েছে—"ও-মণি যদি আসল সবুজমণিই হয়, তাহলে তো তোমরা বেঘোরে মারা পড়েছ। নিজেরা কাজ করাতে পারছ না মণি দিয়ে, তাই আমাকে ধরে আনলে সেই কাজ করিয়ে নেবার জন্য। কিন্তু মণিটি কোন্ সাহসে দেবে আমার হাতে? ওটি যদি আসলই

হয়, আমি তো ওকে প্রথম আদেশই করব–তোমাদের দুই বদমাইশকে যমালয়ে পাঠাবার জন্য।"–তখন ?

শুনে তো চক্ষুস্থির ওদের। মেয়েটা দজ্জাল কম নয় তো! সেই থেকে, মণি আসল না নকল, এমরেল্ডাকে দিয়ে সেটা পরখ করানো, ওদের আর সাহসে কুলোচ্ছে না। এখন দু'জনে পরামর্শ করে বসে আছে। পথের মাঝে ও-ব্যাপার নিয়ে আর ঝামেলা বাধিয়ে কাজ নেই। আলবুর্জের সেই স্বপ্নের দেশে পৌঁছোনো যাক আগে, তারপরে চেষ্টা করা যাবে ওকে বশে আনবার।

স্বপ্নের দেশে পৌঁছোনো! মুস্কিল কি তাতেই কম? বিশ বছর আগে আলবুর্জ একবার সেখানে গিয়েছিল এক জার্মান সাফারির শিকারী হয়ে। তখন দলে দক্ষ গাইড ছিল। পথ বাৎলানোর দায়িত্ব ছিল তারই। আলবুর্জ পথ চলেছে বটে, কিন্তু পথটা কোন্‌দিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছে, তা ঠাউরে দেখার দরকার কদাপি বোঝেনি। এখন হাত কামড়াচ্ছে। তখনকার সেই অবহেলার কথা স্মরণ করে। এঃ, তখন যদি পথচলার সময় চক্ষু দুটি খুলে রাখা যেতো, আজ কি পদে পদে পথভুল হয়? পথের পাশে বস্তি আছে কাফ্রীদের। যে-বস্তিকে নরখাদক জাতির বাসস্থান বলে সন্দেহ করবার কিছুমাত্র কারণ দেখা যায়, সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করতে হয় সেটাকে এড়িয়ে যাবার। যে-বস্তিকে ওদিক দিয়ে নিরাপদ মনে হয়, খোঁজখবর বা খাদ্য পানীয়ের জন্য ঢোকা যায় শুধু তারই ভিতরে, তা মেলে না কোনোটাই। আলবুর্জ যখন তার স্বপ্নের দেশের কথা তোলে, তারা সরলভাবে জানিয়ে দেয়, "আমরা কখনো নিজের গাঁ থেকে এক সূয্যির চেয়ে বেশী দূরে যাই না। আমাদের ওসব জিজ্ঞাসা করা মিছে।" এক সূয্যি! মানে ভোরবেলা থেকে সাঁঝের বেলা। সেটুকু সময়ে কতদূর আর হাঁটতে পারে লোকে? আলবুর্জের যা মোটামুটি ধারণা আছে তার সে স্বপ্নের দেশের দূরত্ব দেড়শো মাইলের কম হবে না এখান থেকে।

তবু পথ চলে ওরা। এমরেল্ডা চলে দুর্ভাগ্যের তাড়নায়। আর আলবুর্জ-রীকি চলে ভাগ্যোদয়ের প্রত্যাশায়। পথের শেষ যে কোথায়, তা কেউ জানে না।

তিনটে দল। সঠিক বলতে গেলে, দু'টো দল আর একটা একক মানুষ। একক মানুষটি যে টারজান, তা বোধ হয় বলে না দিলেও চলে।

দু'টো দলের একটাতে আলবুর্জ-রীকি-এমরেল্ডা। দ্বিতীয়ে আছে হেক্টর আর তার সাফারির ছয়টা কালো।

তিনটে দল চলেছে একই উত্তর দিকে। আলবুর্জরা চলেছে তাদের স্বপ্নের দেশের সন্ধানে। হেক্টরেরা চলেছে এমরেল্ডার খোঁজে। তার অনুচরেরাই তাকে বলেছে উত্তর দিকটা আগে দেখে আসতে। কারণ ঐ দিকেই লোকালয় বিরল। যারা কোনো অপরাধ করে গা-ঢাকা দিতে চায়, তাদের পক্ষে আত্মগোপন করে দিন কাটাবার মতো নিরাপদ স্থান ওদিকেই বেশী।

আর টারজান? সে চলেছে নিজের চক্ষু-কর্ণ-নাসিকার নির্দেশ অনুযায়ী: একটা কচি ডাল ভেঙে পড়ে আছে। টারজানের চক্ষু তা দেখে একটা বিশেষ বার্তা জানাবে টারজানকে। শকুন দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার ডাক শোনা যাচ্ছে বহুদূর থেকে। ও-ডাকেরও বিশেষ তাৎপর্য আছে টারজানের কানে। আর নাক? সংবাদ আহরণে তার দক্ষতা তো সবচেয়ে বেশী! বাতাস তো সর্বত্র সঞ্চারী! সেই বাতাসে ভর করে আনাগোনা করছে নানা জাতীয় গন্ধ। কোন্ গন্ধটা কিসের, টারজান তা বিশ্লেষণ করতে জানে!

হর্ন-হেক্টরের চিঠি পেয়েই সে রওনা হয়ে পড়েছিল ঘর ছেড়ে। চলে এসেছিল হেক্টরদের পরিত্যক্ত ছাউনিতে। কারণ হেক্টর তার সাফারি নিয়ে আগেই বেরিয়ে পড়েছে এমরেল্ডার অনুসন্ধানে।

ছাউনিটার নিকটেই বিরাট বিরাট গাছ। তারই একটার চারতলার ডালে উঠে টারজান একবার সরেজমিনটা পর্যবেক্ষণ করে নিল। একদিকে ঐ যে মুণ্ডুকাটা সিংহের কঙ্কালটা পড়ে আছে। এমরেল্ডার বন্দুকধারীও ঐখানেই মারা পড়েছিল, তা তার দেহ তো হেক্টরেরা কবর দিয়েই গিয়েছে স্থানত্যাগের আগেই। টারজান দেখবে, স্থানটা পরীক্ষা করবে অবশ্য। যেখানে অমন একটা বৃহৎ দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে, দশ-বারো দিন আগেকার দুর্ঘটনা হলেও তার কিছুমাত্র প্রতিধ্বনি যে এখনও মানবেন্দ্রিয়ের অগোচরে ওখানে অনুরণিত হচ্ছে না, তা টারজান বিশ্বাস করে না।

অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করতেই টারজানের চোখে পড়ল ছাইগাদা একটা। ছাই মানেই মানুষের অস্তিত্ব। ছাইটা অনেকখানি জায়গা নিয়ে ছড়ানো। তার মানে ছাইগুলো পুরোনো, ছড়িয়েছে এলোমেলো বাতাসে।

আগে এই ছাইগুলো পরীক্ষা করে আসাই যুক্তিযুক্ত মনে হলো টারজানের। কারা জ্বেলেছিল আগুন? কোন্ জাতির মানুষ? তারপর তারা গেল কোথায়? প্রশ্ন আছে অনেক, দেখা যাক, তার কয়টার উত্তর পাওয়া যায় পর্যবেক্ষণে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই, অরণ্যশূন্য পথে, অর্থাৎ গাছ থেকে গাছে লাফাতে লাফাতে, টারজান গিয়ে উপস্থিত হলো সেই ছাইগাদার নিকটে। ছাইয়ের পরিমাণ কম। তার মানে এখানে যারা সাময়িকভাবে অবস্থান করেছিল, দলে তারা বেশী লোক ছিল না। বড়জোর সাত-আটজন। কোন্ জাতির লোক? অনেকক্ষণ ধরে এদিক ওদিক ঘুরতে হলো টারজানকে। মেহনত বৃথা গেল না। পাওয়া গেল ছেঁড়া মোজা একটুকরো। এ তো নিশ্চয়ই কোনো সাদা আদমির!

সাদা? দু'টো সাদা দুর্বৃত্ত দুষ্ট গ্রহের মতো ঘুরছে কিছুদিন ধরে, এমরেল্ডার পিছনে। আলবুর্জ আর রীকি! আবার তারাই নয় তো? এই মারাত্মক দুর্ঘটনার মধ্যে ঐ দুর্বৃত্তযুগলের

পাওয়া গেল ছেঁড়া মোজা একটুকরো

কোনো-না-কোনোভাবে জড়িত থাকা তো অসম্ভব নয় মোটেই!

সাদা লোক ছিল এখানে। আলবুর্জ-রীকিরা যদি থেকে থাকে, তারা তো মোটে দুইজন। সাফারিতে সাত-আটটি লোক ছিল, ছাইয়ের পরিমাণ থেকে বোঝা যায়। বেশী লোক থাকলে কুন্ডটা হতো বড়, আগুন জ্বলত বেশী জায়গা নিয়ে, ছাই জমত বেশী।

তা কিছু হয়নি। অতএব এ-দলে কালো ছিল পাঁচ-ছয়টি। টারজান বসে বসে ভাবল বেশ কিছুক্ষণ। তার ওয়াজিরি চরদের মুখে একটা জরুরী খবর সে কিছুদিন আগে পেয়েছিল। খবরটা এই যে ছানছানু উপজাতির নরখাদকেরা এই অঞ্চলে টহল দিচ্ছে শিকারের খোঁজে। টারজানের খামারে তারা ঢোকেনি। এমন কি তার পঞ্চাশ মাইলের মধ্যেও যায়নি, কাজেই চরগুলিকে নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া ছাড়া অন্য কিছুই ব্যবস্থা সে নেয়নি ও-ব্যাপারে।

তখন ব্যবস্থা নেয়নি, কিন্তু নিলেই বোধ হয় ভাল করত। তারা এসেছিল, তার কি কোনো চিহ্নই তারা রেখে যায়নি এই ছাউনির আশেপাশে? গোমাংগানি (কৃষ্ণাংগ) জাতির গায়ের গন্ধ আজ এতদিন পরেও ভুরভুর করছে এখানে। কিন্তু তাতে তো নতুন কিছু বোঝা যায় না। গোমাংগানি—তা সে নরখাদক হোক বা না-হোক, তাদের সবাইয়েরই গায়ের গন্ধ একই রকম। ছানছানুরা এখানে এসেছিল কিনা, এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর টারজান পাচ্ছে না।

কিন্তু যে-প্রশ্ন আদৌ সে করেনি, দৈবাৎ তারই উত্তর সে পেয়ে গেল এক জায়গায়। এক চাংগড় ওলটানো পাথর আর তার পাশেই অপেক্ষাকৃত নরম মাটিতে একটা পায়ের দাগ। এ-দাগ যে কার পায়ের, এক সেকেন্ডেই তা বুঝতে পেরেছে টারজান। সিংহের পা। সিংহ এসেছিল এখানে। সম্ভবতঃ মানুষে ন্যুমায় লড়াই হয়েছিল কিছু। তাতে আর কিছু না হোক, ঐ পাথরখানা হয়েছিল স্থানচ্যুত, আর নীচের নরম মাটিতে পড়ে গিয়েছিল ন্যুমা মহারাজের থাবার দাগ।

তারপর কী হলো?

আলবুর্জ-রীকিদের দল যদি এখানে এসে থাকে, তারা কি অমনি-অমনি অন্যদিকে চলে গেল?

এর জবাব পেতে হলে টারজানকে আগে একবার দেখে আসতে হয় সেই স্থানটা, যেখানে গলা-কাটা সিংহের কংকাল পড়ে আছে এখনো। টারজান এইবার সেইদিকে চললো।

কংকাল পড়ে আছে একটা নাবাল জমিতে। তার কিছুদূরে গড়ানে চড়াই ক্রমে গিয়ে উপরের পাহাড়ে মিশেছে। সেই চড়াইয়ের গায়ে, একটা সর্পিল রেখা ধরে একটার পরে একটা ছোট ছোট পাথরকে দেখা যাচ্ছে স্থানভ্রষ্ট। দুই এক জায়গায় মানুষের পায়ের দাগও। দাগ দুই রকম। ঊর্ধ্বমুখীও, নিম্নমুখীও। অর্থাৎ কিছু লোক উঠেওছে, নেমেওছে।

সেই "কিছু" লোক কারা? যারা ওঠা-নামা করেছে, তাদের পায়ে জুতো ছিল। তবে কোনো কোনো কালো জাতির লোক মোষ বা শূওরের চামড়ার পট্টি বাঁধে পায়ের তলায়। তারও দাগ জুতোর দাগের মতোই দেখায়। এমরেল্ডার পায়ে যদি সেই চম্পলই থেকে থাকে, যা ভাল্দা থেকে বিদায়ের দিন তাঁর

পায়ে দেখা গিয়েছিল, তাহলে তারও দাগ এই রকমই পড়ার কথা।

টারজান চড়াই উঠে পাহাড়ের কাঁধায় কাঁধায় একটা পথের মতো আবিষ্কার করল। এ-পথ কারও হাতের তৈরী নয়, যুগ-যুগের জলধারায় আর হাওয়ার ঝাপটায় পাথর আপনা থেকে ক্ষয়ে গিয়ে সৃষ্টি করেছে এটা। নীরেট পাথর একেবারে। তার উপরে কোনো দাগ পড়া সম্ভব নয়। তবু টারজান সেই প্রকৃতি-সৃষ্ট পথ ধরেই এগুতে লাগল। দেখাই যাক না, কোথায় নিয়ে যায় এই পথ।

অনেকটা দূরে গিয়ে সেই পথ পরিণত হলো আর একটা উৎরাইয়ে। তার গায়ে আবার একটা আঁকা-বাঁকা পথ, তার যত্র-তত্র স্থানচ্যুত পাথরের টুকরো। এবং—

একেবারে নীচে একটা নাবাল জমি, তার মাটি নরম, স্পষ্ট দাগ সেখানে জুতোর। টারজান গুনলো, তিন জোড়া জুতোর দাগ পড়েছে।

তিন জোড়া? আলবুর্জ-রীকির আর এমরেল্ডার?

অনেক লোকের পদচিহ্ন। তার মধ্যে তিন জোড়া পায়ে পাদুকা ছিল, অনেক জোড়া পায়ে ছিল না। অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের মিলিত একটা দল। দলটা কি আলবুর্জ-রীকির সাফারি?

সারাদিন সেই ধারাবাহিক পদচিহ্ন অনুসরণ করে করে পাহাড় জঙ্গল অতিক্রম করল টারজান। নগ্ন পথগুলোর ছাপ জঙ্গলে ঢুকে গেল একসময়। জুতো-পরা পায়েরা চলতেই থাকল সমুখে। অর্থাৎ এইখানে এসে সাফারি ভেঙ্গে দিয়েছে শ্বেতাঙ্গেরা। নিজেরা চলে গিয়েছে সোজা উত্তরে।

টারজান দিগ্-নির্ণয়ের প্রয়োজনে একবার গাছের মাথায় উঠল। বহুদূরে হলেও একটা পাহাড়ের কাঁধায় ঐ দেখা যায় ছানছানু নরখাদকের গ্রামটা। মাইল পঞ্চাশ তো বটেই!

টারজান সারাদিনের পরিশ্রমে আবিষ্কার করেছে কয়েকটা তথ্য। গলা-কাটা সিংহের কঙ্কাল যেখানে পড়ে আছে, সেইখানে অভিনয় হয়েছিল এক মর্মান্তিক নাটকের। দুটি শ্বেতাঙ্গ, তারা আলবুর্জ-রীকি হতেও পারে, না-ও পারে, ওখানে ডাকাতি করেছে একটা, ধরে নিয়ে গিয়েছে এমরেল্ডাকে। কী উদ্দেশ্যে, কে বলবে।

আলবুর্জ-রীকিই যদি হয় ঐ শ্বেতাঙ্গেরা, তবে তো বলতে হবে, এটা তাদের দ্বিতীয় অপরাধ। প্রথম অমার্জনীয় পাপ তাদের—আসল এবং নকল দুটো সবুজমণির অপহরণ।

শাস্তি তাদের পেতে হবেই। আফ্রিকার রাষ্ট্রীয় শাসন শিথিল। কিন্তু গুরুতর কোনো অন্যায় করে কেউ এখানে রেহাই পেয়ে যাবে না, অন্য কেউ তার সাজা না দিক, টারজান তা দেবেই।

বেলা এখনও কিছু আছে। ছানছানুদের গ্রামটা এই বেলা ঘুরে এলে দোষ কী? এমরেল্ডাকে নিয়ে আলবুর্জ-রীকি যদি সোজা বনপথ ধরে থাকে, তবে আজ হোক, কাল হোক তারা ধরা পড়বেই টারজানের হাতে। কিন্তু এমন যদি হয় যে তারাই ধরা পড়েছে ছানছানুদের হাতে, তাহলে তাদের উদ্ধারের

সে সেই গাছের তলে নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল

চেষ্টা অবিলম্বে করা উচিত। এমনিতেই যথেষ্ট দেরি হয়ে গিয়েছে। এতদিন তারা নরখাদকদের উদরে প্রবেশ করেছে কিনা, তাই বা কে জানে!

বেচারী! বেচারী এমরেল্ডা! ভালকুভামের কবল থেকে টারজান ওকে উদ্ধার করেছিল কি রাক্ষসের গ্রাসে নিক্ষেপ করার জন্যই?

হ্যাঁ, মহারণ্যের অন্দর দিয়ে, আলবুর্জ-রীকির অনুসরণ কাল শুরু করলেও ক্ষতি হবে না। আজকার দিনটা ছানছানুদেরই কল্যাণে ব্যয় করবে টারজান। কোনো অজানা কারণে তারা যদি ওদের গ্রামেই চলে গিয়ে থাকে, আর টারজান যদি সোজা বনের পথ ধরে উত্তরমুখো চলতেই থাকে, কস্মিনকালেও তো আর টারজান খোঁজ পাবে না ওদের।

অতএব আরণ্যশূন্য পথে মেইল ট্রেনের চেয়ে দ্রুততর বেগে ধাবিত হতে হলো টারজানকে। ছানছানু গ্রামের উপান্তে পৌঁছে গেল সন্ধ্যার আগেই। ভালই হলো। অনুসন্ধান তো সন্ধ্যার আগে শুরু করা যাবে না! ততক্ষণ বিশ্রাম করে নেওয়া যাক। মৃগমাংস কাঁধে ঝোলানোই আছে, পানীয় জলের ব্যবস্থা প্রতি গ্রামেই আছে। নদী বা ঝর্ণা বা হ্রদ।

রাত্রি এলো। আকাশে চাঁদ নেই, একটা কালো পর্দা যেন নেমে এল অরণ্য, লোকালয় সব কিছুর উপরে। টারজান বিশ্রাম নিচ্ছিল এক মহামহীরুহের তেডালায়, এইবার সে নামল গাছ থেকে। নিদ্রাভঙ্গে পশুরাজ ন্যমা যেমন করে আড়মোড়া ভাঙ্গে, টারজান ভাঙ্গল সেই ভাবেই। বস্তুতঃ চাল-চলনে সিংহের সঙ্গে আশ্চর্য মিল আছে টারজানের। সিংহেরই মতন ভুবন-কাঁপানো নাদও এক একসময় স্বতঃই বেরিয়ে পড়ে তার বিশাল কবাটবক্ষের ভিতর থেকে।

পায়ের নীচে উপত্যকা। তার কোণে কোণে এক একসারি আলো। বিভিন্ন গ্রামের আলো ও-সব। যে-সারিতে আলোর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, সেই সারির দিকেই এগুলো টারজান। নেংটি-পরা সেই দানবমূর্তিকে দেখে কে তখন চিনবে লর্ড গ্রেস্টোফকে।

যেখান থেকে টারজান নামল, ঠিক সেখানেই ডেকে উঠল একটা সিংহ। সেও গ্রামের দিকেই নামছে। পল্‌কা বেড়ায় ঘেরা ছোট ছোট গোয়ালে গ্রামবাসীদের গরু ছাগল ঝিমোচ্ছে, সে-খবর রাখে সিংহেরা।

সিংহের হুংকার শুনে টারজানেরও কী যে হলো, অন্ধকার আকাশের দিকে মুখ তুলে সে-গর্জনের জবাবে পালটা গর্জন সেও ছাড়ল একটা। দূরে দূরে গ্রামে গ্রামে আদিবাসীদের চোখ ভয়ে ছানাবড়া হয়ে গেল সে-নিনাদ শুনে। যোদ্ধারা দৌড়ে এসে বল্লম হাতে নিল। মায়েরা শিশুদের নিবিড় করে আঁকড়ে ধরল বুকের ভিতর।

"দানো"—বলল কেউ একজন।

এক গ্রামের সর্দার বলল—"ও চীৎকার আমি আগেও একদিন শুনেছিলাম। ও হলো ওয়াজিরিদের পিশাচ-দেবতার গর্জন।"

"ওয়াজিরির দেবতা? সে কী করতে মরতে আসবে এদেশে?"—মন্তব্য করল আর একজন—"ওদের দেশে হামলা করতে আমরা যেবার গিয়েছিলাম, তার পরে তো ঢের ঢের বার বর্ষা এসেছে গিয়েছে এদেশে।"

এক বুড়ো বলল—"আমি যখন এ্যাত্তোটুকুন ছোট, যুদ্ধযাত্রী একটা দলের সঙ্গে ভিড়ে আমি পশ্চিম অঞ্চলে গিয়েছিলাম। সেই যে সূয্যি যেখানে ঘুমোয়, অজগর জঙ্গলে লম্বাচুলো গেছো মানুষরা যেখানে ডেরা বাঁধে পাহাড়-সমান সব গাছে, সেই গেছো মানুষরা ঐ রকম আওয়াজ করে, শুনেছি। যা শুনলে আমাদের মতো লোকের বুকের ধুকধুক থেমে যায়, ঠাণ্ডা হয়ে আসে গায়ের চামড়া। এ চীৎকারও সেই জাতের কোনো গেছো মানুষের হবে। সেবারে আমরা বহুদিন বাইরে ছিলাম, বেরুলাম বর্ষা শেষ হতেই। ফিরতে ফিরতে আর এক বর্ষা শুরু হয়ে গেল। তখন যোদ্ধা হিসেবে আমার নামডাক কত! লড়াইয়ে লড়াইয়ে বহু জোয়ান খতম করেছিলাম আমি। তাদের কলিজাগুলো আমি খেয়েছিলাম রে! তা নইলে শুধু শুধু কি আর আমি এত বড় বীর হতে পেরেছি!

কেউ শুনছে না তার কথা। তবু সে বকবক করেই যাচ্ছে। অন্যরা কান পেতে আছে, সেই দানোর গর্জন আবার শোনা যায় কিনা। তারা আলোচনা করে একমত হয়েছে যে ও-রকম অপার্থিব চীৎকার শোনা যেতে পারে একমাত্র বহিঃশত্রুর আক্রমণের প্রাক্কালে। কোন্ ভিত্তিতে বা কোন্ যুক্তিতে এমন সিদ্ধান্তে তারা পৌঁছোলো, তা অবশ্য তাদের নিজের কাছেও পরিষ্কার নয়।

ছানছানু সর্দারের বাড়িটা উঁচু বেড়া দিয়ে ঘেরা। টারজান এসে সেই বেড়ার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। ঘেরার ভিতর থেকে একটা গাছ তার ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে বাইরেও। টারজান সেই ডালে উঠে বসল ভিতরের অবস্থা লক্ষ্য করার জন্য। টারজানের গর্জন শুনে জোয়ানেরা যে-ভয়টা পেয়েছিল, সেটা ওরা আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠছে। কারণ দ্বিতীয় গর্জন তো আর যায়নি শোনা! এইবার মেয়েরা রান্নায় মন দিল, আর পুরুষেরা? তারা তো সৃষ্টির সেরা জীব। কিছু না করে বসে বসে ঝিমোনোই তো তাদের জন্মগত অধিকার! তারা সেই কর্মেই লেগে গেল।

টারজান অপেক্ষা করছে। এখন মেয়েরা অন্ততঃ জেগে আছে। তার পক্ষে এখনই ভিতরে ঢোকা নিরাপদ হবে না। খেয়ে-দেয়ে ওরা ঘুমোবে যখন, টারজানের তখনই হবে কাজ করবার সময়।

অপেক্ষা? শ্বাপদেরা শিকারের প্রতীক্ষায় ঘন্টার পরে ঘন্টা জড়বৎ নিশ্চল হয়ে একই জায়গায় একই ভঙ্গীতে পড়ে থাকে। টারজানও প্রায় শ্বাপদেরই সামিল সেদিক দিয়ে। সে সেই গাছের ডালে নিশ্চল হয়ে বসে রইল দুপুর রাত পর্যন্ত।

[চলবে]

সময় এসেছে নতুন করে ভাবার

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

মার্শাল ও কপিল

এক দিনের ক্রিকেটে ভারত এখনও বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। আসছে বছর ভারত ও পাকিস্তানে পরবর্তী বিশ্ব কাপের খেলা হওয়া পর্যন্ত থাকবেও তাই। কিন্তু বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দল তার মর্যাদা রাখতে পারছে না। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠছে না। হেরে যাচ্ছে পাকিস্তানের কাছেও। এবার শারজায় চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ভারত চারটি দেশের মধ্যে তৃতীয় হয়েছে। প্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দ্বিতীয় পাকিস্তান, তৃতীয় ভারত এবং চতুর্থ স্থান পেয়েছে শ্রীলঙ্কা।

এখন ভারতে পাকিস্তান খেলতে এসেছে। শ্রীলঙ্কা সবে দেশে ফিরে গেলো। আসছে বছরের বিশ্ব কাপের দিকে লক্ষ্য রেখে ভারতীয় দলটি গড়ে নেবার দরকার এখনই। ইংলন্ড, অস্ট্রেলিয়া সেই চেষ্টা শুরু করেছে অনেক দিন আগে থেকে। গতবারের রানার্সআপ ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রস্তুত হয়ে তাল ঠুকছে বিশ্ব শ্রেষ্ঠত্বের খেতাব ফিরে পাবার জন্যে। পাকিস্তান তার দল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। শ্রীলঙ্কা তৈরি। এমন কি জিম্বাবুয়েও নিজেদের প্রস্তুত করে নিয়েই ভারতে খেলতে আসছে। এই দেশগুলির পাশাপাশি ভারতের প্রস্তুতির দিকটায় একবার তাকালে অবাক হতে হয়। প্রত্যেক দলের দিকে তাকালে দেখা যাবে চার বছর আগে বিশ্বকাপে যাঁরা খেলেছিলেন তাঁদের অনেকেই নেই। কিন্তু ভারতে ? প্রায় সেই দলই আছে। শুধু মাঝের দিকে ব্যাটিংয়ের জন্যে যাঁকে দরকার ছিলো সেই, মহিন্দর অমরনাথকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ ফিরিয়ে আনা হয়েছে মদনলালকে। খেলানো হচ্ছে না চেতন শর্মার মতো উঠতি নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়কে। অরুণলাল পাচ্ছেন না তাঁর যোগ্যতার পুরস্কার।

শারজায় চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর বিষয়টি নিয়ে আবার নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করার সময় এসেছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানের কাছে ভারত যেভাবে হেরেছে তাতে লজ্জা পাবারই কথা। ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা অনেক সময়ই ভুলে যান যে তাঁরা একদিনের ক্রিকেট খেলছেন। তাঁদের তাড়াতাড়ি রানের পেছনে ছুটতে হবে! আরও একটা বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। ব্যাটিংয়ের 'ডেপথের' দিক দিয়ে ভারত এখন এক নম্বরে। ভারতীয় দলের দশ নম্বর খেলোয়াড় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যান। তবু দেখা যাচ্ছে, গাভাসকার আর শ্রীকান্ত অল্প রানে ফিরে গেলেই ভারতীয় দলে ধস নামছে। শারজায় চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে এই সত্য আরও একবার প্রমাণিত হয়েছে। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের এই ব্যর্থতার জন্যে কথা উঠেছে মিডল অর্ডার জোরদার করতে মহিন্দর অমরনাথকে ফিরিয়ে আনার। ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের পেছনে মহিন্দর অমরনাথের অবদান ছিলো অপরিসীম। তবু বছর দুয়েক হলো মহিন্দর অমরনাথকে একদিনের ক্রিকেট

থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। টেস্ট দল থেকেও তাঁকে বাদ দেওয়ার কথা মাথায় আছে ভারতীয় ক্রিকেটের কর্তাদের। কিন্তু মহিন্দরের মতো অমন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান হিসেবে আর কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই জিমি অমরনাথ এখনও খেলছেন।

যাই হোক চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ভারত প্রথম খেলায় সহজেই হারিয়েছিল শ্রীলঙ্কাকে। সেদিন ভারতীয়দের খেলা দেখে চিন্তিত হয়েছিলেন ক্যারিবিয়ান দলপতি ভিভিয়ান রিচার্ডস। তাঁর চিন্তা যে অমূলক ছিলো না ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে ভারতের খেলা আরম্ভ হতেই তা বোঝা গিয়েছিলো। ক্যারিবিয়ান ব্যাটসম্যানরা মোটেই সুবিধে করতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত ১৯৮ রান তুললো তারা। ৪৫ ওভারে ঐ রান তোলা ভারতের পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু শ্রীকান্ত ইনিংসের শুরুতেই আউট হয়ে গেলেন। গাভাসকার আজাহার লড়লেন। কিন্তু সে লড়াই হলো অনেকটা টেস্ট ক্রিকেটের ধাঁচে। যখন তাঁদের খেয়াল হলো তখন বড্ডই দেরি হয়ে গেছে। ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারতে হলো ভারতকে। এবং পাকিস্তান, ভারত ও শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতলো।

এবার দ্বিতীয় স্থান দখলের খেলা। ভারত ও পাকিস্তান দু দলই হারিয়ে ছিলো শ্রীলঙ্কাকে। এবার নিজেদের মধ্যে খেলায় যে জিতবে সেই পাবে দ্বিতীয় স্থান। ইমরান টসে জিতে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠালেন। আজাহারউদ্দিন আর কপিলদেব ছাড়া কেউই ব্যাটিংয়ে সুবিধে করতে পারলেন না। দেড়শো রান তুলতে পারলো না ভারত। মনে হয়েছিলো পাকিস্তান বুঝি সহজেই জিতে যাবে। তা কিন্তু হলো না। মনিন্দর সিং আর রবি শাস্ত্রী দুরন্ত বোলিং করে পাকিস্তানকে কোণঠাসা করে ফেলেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। অতো কম রানের মূলধন নিয়ে কী আর লড়া যায়! ভারত হারলো তিন উইকেটে। প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যানরা পারলেন না। পাকিস্তানকে জিতিয়ে দিলেন তাঁদের বোলাররাই—দারুণ ব্যাট করে।

যাই হোক ফেডারেশন কাপ, সিকিমের গভর্নস গোল্ড কাপ, দিল্লির ডুরান্ড কাপ জেতার পর মোহনবাগান স্বপ্ন দেখছিলো বোম্বায়ের রোভার্স কাপ জেতার। কিন্তু তাদের সে 'স্বপ্ন ভঙ্গ' করে দিয়েছে গোয়ার ডেম্পো। রোভার্স কাপের ফাইনালে ডেম্পো মোহনবাগানকে ২–0 গোলে হারিয়ে দিয়ে সকলকে অবাক করে দিয়েছে। ইস্টবেঙ্গলকে

গ্রের বল ঘুরিয়ে মারছেন গাভাসকার

বুখাতিরের সঙ্গে চ্যাম্পিয়নস্ ট্রফি বিজয়ী ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল।

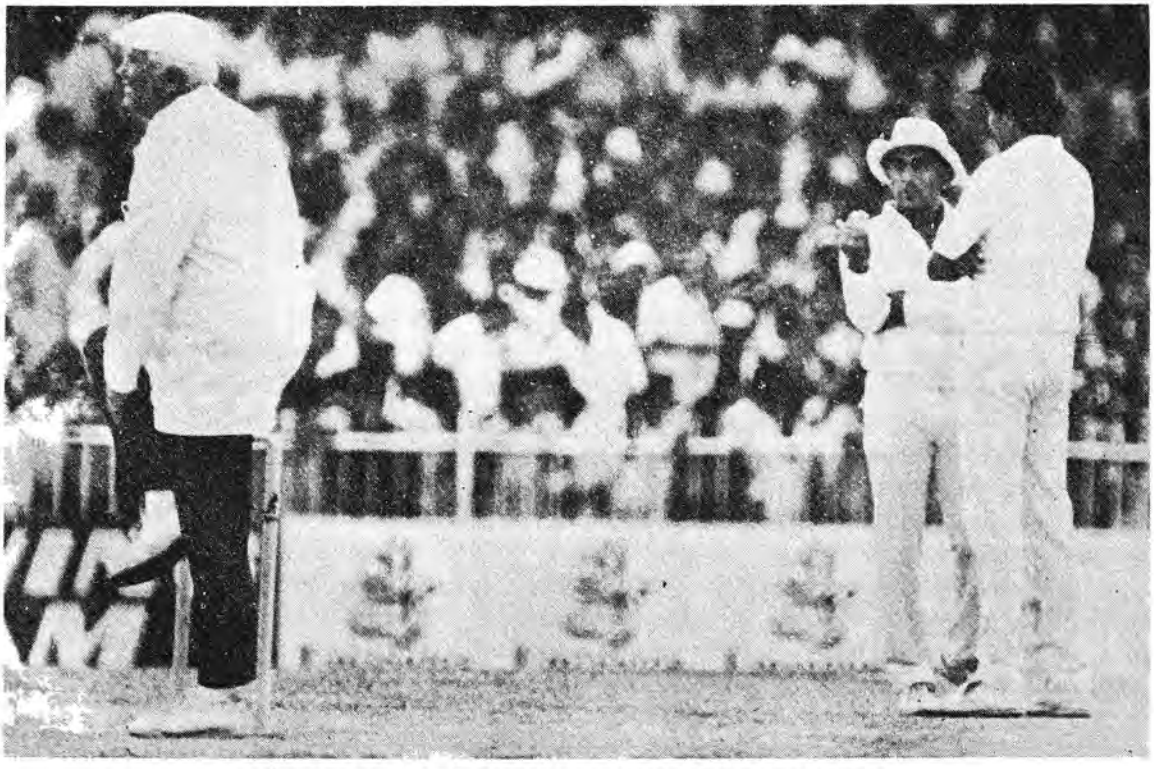

পাকিস্তানের সঙ্গে খেলার সময় আলোচনা করছেন গাভাসকার ও কপিল

শাস্ত্রীর বল ঘুরিয়ে মারছেন লোগি।

হারিয়ে ডেম্পো যখন ফাইনালে উঠেছিলো তখনই বোঝা গিয়েছিলো ওদের শক্তি অবহেলা করার মতো নয়। আর সালগাঁওকারকে হারাতে মোহনবাগানকে ম্যারাথন টাইভাঙার খেলা খেলতে হয়েছিলো। গোয়ার সালগাঁওকারকে সরাসরি হারাতে না পারায় মনের মধ্যে যে সন্দেহ দেখা দিয়েছেলো তারই প্রমাণ পাওয়া গেলো ফাইনাল খেলায়।

এশিয়াডে ভারতীয় ফুটবল দলের ব্যর্থতার পর এখন ভারতীয় ফুটবল নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করার সময় এসেছে। অবশ্য এ বিষয়ে পথ দেখাচ্ছে টাটা। জামসেদপুরে তারা ছোটদের ফুটবল খেলা শেখাবার একাডেমি করেছে। চুনী গোস্বামী তার প্রধান। তাঁর সহকারী মহম্মদ হাবিব। দু'জনে সারা ভারত খুঁজে ছোট ছোট ছেলেদের বেছে নিয়েছিলেন। জানুয়ারি মাস থেকেই তাদের ট্রেনিং শুরু হবে। প্রত্যেক মাসে মাসে ভালো টাকা বৃত্তি পাবে। জামসেদপুরে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা টাটার একাডেমির। ওখানেই ওরা স্কুলে পড়বে। বছরে বাড়ি যাওয়ার জন্যে পর্যন্ত টাকা পাবে। শুধু তাই নয়—বড় হয়ে ওরা সকলেই টাটাতেই চাকরি পাবে। টাটা সত্যিই পথ দেখালো। টাটার মতো আরও কয়েকটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যদি এগিয়ে আসে তা'হলে ভারতে ফুটবল খেলার মান আজ না হোক কাল উন্নত হবেই। চুনী গোস্বামী বলেছেন, কয়েকটা বছর অপেক্ষা করুন ভারতকে টাটা দারুণ সব খেলোয়াড় উপহার দেবে। যারা দেশের মান-সম্মান বাড়াবে।

দেখা যাক কি হয়।

শারজা থেকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির এই ছবিগুলি তুলে এনেছেন সুমন চট্টোপাধ্যায়

গল্প হলেও সত্যি

১৯৭৮ সাল। দীর্ঘদিন পরে আবার শুরু হলো ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট সিরিজ। ১৯৬০-৬১ সালের পর দু দেশের মধ্যে খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আবার শুরু হলো ১৯৭৮ সালে। ভারত-পাকিস্তানের খেলা মানেই প্রেসটিজের লড়াই। পাকিস্তানের যে সব খেলোয়াড়রা কেরি প্যাকারের দলে খেলতে গিয়েছিলেন—তাঁদের ফিরিয়ে আনলো পাকিস্তান।

ওদিকে বিষেণ সিং বেদীর নেতৃত্বে ভারত গিয়ে পৌঁছুলো পাকিস্তানে। ফতে সিং রাও গায়কোয়াড় ভারতীয় দলের ম্যানেজার। রাজা মানুষ, মনটাও দরাজ। করাচিতে দু দেশের মধ্যে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ হচ্ছে। গাভাসকার প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করেছেন। দ্বিতীয় ইনিংসেও দারুণ খেলছেন তিনি। বিরতির সময় গায়কোয়াড় সাহেব সুনীলকে বললেন, সুনীল সেকেন্ড ইনিংসেও তুমি যদি সেঞ্চুরি করতে পারো তাহলে আমার এই ঘড়িটা তোমায় দিয়ে দেবো।

গায়কোয়াড় সাহেবের হাতে ছিলো খুবই দামি একটা ঘড়ি। সেই ঘড়ি বিশ্বের সব বড় শহরের সময় দেখা যায়। সুনীল গাভাসকার বোধহয় চ্যালেঞ্জটা নিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে দারুণ খেলতে লাগলেন তিনি। দেখতে দেখতে একসময় করে ফেললেন সেঞ্চুরি। ১৩৬ রান করে আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে আসতেই গায়কোয়াড় সাহেব হাতের ঘড়িটা খুলে পরিয়ে দিলেন সুনীল গাভাসকারের হাতে।

তবু কিন্তু সেই টেস্টে হার এড়াতে পারেনি ভারত। খেলার শেষ দিনের শেষ ঘণ্টার বাধ্যতামূলক কুড়ি ওভার যখন শুরু হলো জেতার জন্যে তখন পাকিস্তানের দরকার ১৩৭ রান। অর্থাৎ ওভার প্রতি ৬.৮৫ রান করতে হবে তাদের। তাই করে আট উইকেটে জিতে গেলো পাকিস্তান। সেই ইনিংসে মজিদ খান ১৪, আসিফ ইকবাল ৪৪, জাভেদ মিয়াদাদ অপরাজিত ৬৩ ও ইমরান খান অপরাজিত ৩১ রান করেছিলেন।

পড়ার সঙ্গে খেলা

সেন্ট মার্গারেট'স স্কুল

স্নিগ্ধা বসু

উত্তর কলকাতার সেন্ট মার্গারেট স্কুল একটি নামী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ছাত্রীদের পড়াশুনোর সঙ্গে সঙ্গে খেলাধূলাতেও সমানভাবে উৎসাহিত করা হয়। আর এব্যাপারে উৎসাহ সবচেয়ে বেশি প্রধান শিক্ষিকা মৃকুলদির। তাঁর অনুপ্রেরণাতেই ছাত্রীরা ধাপে ধাপে এগিয়ে এসেছে খেলাধূলার বিভিন্ন দিকে।

গত দুই বছরে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফলাফল বিচার করলেই উন্নতির ধারা স্পষ্ট হবে।

১৯৮৫তে সাঁতারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখায় শর্মিষ্ঠা দে ও সুস্মিতা দাস। এরা ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত পঞ্চম আন্তর্জাতিক মহিলা ওয়াটারপোলো প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। এছাড়া এরা F.W Calcutta আয়োজিত All India Age Group Swimming Competition এ যোগ দিয়েছিল।

১৯৮৫-র আন্ত বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পাপিয়া দে (VIIIA) ডিসকাস-এ প্রথম ও শট পাট-এ দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। শর্মিষ্ঠা ঘোষ (VIIIA) ফ্ল্যাট রেসে ও অপর্ণা ঘোষাল (VIIIA) রিলে রেসে দ্বিতীয় স্থানটি অধিকার করে। শর্মিষ্ঠা লং জাম্পে তৃতীয় এবং সুস্মিতা গুপ্ত (VIA) ঐ একই ইভেন্টে দ্বিতীয় স্থানে আসে। ডিস্ট্রিট অ্যাথলেটিকস মিট-এ যোগ দেবার জন্য বড়দের গ্রুপে নির্বাচিত হয়েছে মিঠু নান, সুমিতা দাস, মধুরা বিশ্বাস, ইন্দ্রানী চন্দ্র, সোনালী বসু ও রিশ চক্রবর্তী। সাঁতারে মধুরা বিশ্বাস (XB) সুমিতা দাশ (IXA) ও সোনালী সেন (VIIIB) বছরে ৯০০ টাকার সরকারী বৃত্তি পাচ্ছে।

এবার আসা যাক ১৯৮৬-এর ফলাফল বিচারে। ক্রীড়াদিবস হিসাবে চিহ্নিত ২২শে ফেব্রুয়ারীতে পদযাত্রায় এই স্কুল আংশগ্রহণ করেছিল। ২000 টাকার একটি চেকও লাভ করেছে। ঐদিন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে পারদর্শিতা দেখিয়ে তারা বিশেষ সম্মান লাভ করে ও বিশেষ পুরস্কার পায়।

সুমিতা দাস

সোনালী সেন আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় ওয়াটার পোলো-তে অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়া সপ্তম শ্রেণীর অপর ছাত্রী পত্রলেখা চন্দ শ্রীরামপুর সুইমিং সেন্টার আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ১00 মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোকে প্রথম ও ২00 মিঃ ব্যক্তিগত মিডলেতেও দ্বিতীয় হয়েছে।

১৯৮৬ তে অনুষ্ঠিত আন্ত বিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সন্তরণ বিভাগে প্রতিবারের মতো এবারেও এ বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা তাদের সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে। এইসব ছাত্রীরা হলো পত্রলেখা চন্দ (১00 মিঃ ফ্রি স্টাইল-এ দ্বিতীয় ও ১00 মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক-এ প্রথম), সোনালী সেন (১00 মিঃ ফ্রি স্টাইল-এ প্রথম ও ২00 মিঃ বাটার ফ্লাইয়ে প্রথম) এবং মলি রায় (৫0 মিঃ ফ্রি স্টাইল-এ প্রথম, ৫0 মিঃ ব্রেস্ট স্ট্রোক-এ প্রথম, ৫0 মিঃ ব্যাকস্ট্রোক-এ প্রথম)।

এই সংখ্যার সব ছবি সুমন চট্টোপাধ্যায়ের

তোমাদের ? জিজ্ঞাসা

সুকল্যাণ ও অনিরুদ্ধ বসু (কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা)

প্রশ্নঃ টেস্ট খেলায় ক্যাচ লোফায় প্রথম সেঞ্চুরি কে করেন?

উত্তরঃ ইংলন্ডের কলিন কাউড্রে।

সজল কুমার বিশ্বাস (রাণাঘাট, নদীয়া)

প্রশ্নঃ মারাদোনা কতো বছর বয়সে প্রথম বড় ম্যাচ খেলেন?

উত্তরঃ মারাদোনা ১৬ বছর বয়সে প্রথম বড় ম্যাচ খেলেন।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (শিলিগুড়ি)

প্রশ্নঃ মারাদোনার দু পা কতো টাকায় বীমা করা আছে?

উত্তরঃ ভারতীয় মুদ্রায়—ছ কোটি টাকায়।

বাপ্টি, মন্টি ও মৌ মৌ (দ্য মল, কানপুর)

প্রশ্নঃ আসছে বছরের বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা কোথায় হবে?

উত্তরঃ কলকাতায়।

অমিতকুমার কর (সোনারপুর, ২৪ পরগণা)

প্রশ্নঃ মোহনবাগানে বিদেশী খেলোয়াড়রা খেলেন না কেন?

উত্তরঃ মোহনবাগান এখনও কোনো বিদেশী খেলোয়াড়কে খেলায় নি। সেই ট্র্যাডিশান ক্লাব ভাঙতে চায় না।

শঙ্করদেব ব্যানার্জি (কেয়াতলা রোড, কলিকাতা)

প্রশ্নঃ মদনলালকে কাউন্টি দল থেকে ডেকে এনে ভারতীয় দলে খেলানো হয়েছে। এরকম ঘটনা কি আগেও ঘটেছে।

উত্তরঃ হ্যাঁ ঘটেছে।

ব্রুস লি

ডিভোনো ও ম্যাটেরা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছোটদের জন্যে দারুণ সব বই

অ্যাডভেঞ্চার, গোয়েন্দা কাহিনী, গল্প আর উপন্যাস

কবিতা সিংহর
চার পলাতকের কাহিনী ৭.০০

ময়ূখ চৌধুরীর
সংখ্যার নাম চার ১০.০০

দেবল দেববর্মার
নিখোঁজ রতন ১০.০০

প্রলয় সেনের
অভিশপ্ত চূনার ৭.০০

শিশিরকুমার মজুমদারের
পাতালপুরী অভিযান ৭.০০

অনিল ভৌমিকের
অদৃশ্য জলদস্যু ৯.০০

সংকর্ষণ রায়ের
কালনাগিনীর আক্রোশ ৬.০০

সুজিতকুমার সেনগুপ্তর
রক্তমাখা গুপ্তধন ৯.০০
সুন্দরবনের শয়তান ৫.০০

নির্বেদ রায়ের
মুছে গেল পদচিহ্ন ৮.০০

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নট আউট ৫.০০

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮ কলেজ ষ্ট্রীট, কলকাতা–৭০০০৭৩।

পরই কিন্তু শিবনাথের মনে হয়, কে যেন আসছে পেছন পেছন। কার পায়ের যেন স্পষ্ট আওয়াজ পায় শিবনাথ। একটু ভয় পায় শিবনাথ, পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, দিব্যকান্তি এক পুরুষ–জ্যোতিতে চারিদিকের আলো বেড়ে গেছে শতগুণ–লম্বায় প্রায় দোতলার ছাদ সমান। খালি গায়ে সাদা পৈতে পরণে মাত্র কৌপিন আর একটা তীব্র আলোর ছটা আসছে নাভির দিক থেকে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে শিবনাথ। ভাইকে ডেকে বলে, দেখ দেখ। হরও এবার দেখে সেই দিব্য দেহধারীকে। দেখে কিন্তু এতটুকু ভয় পায় না হরনাথ। দাদার হাত ছাড়িয়ে ছুটে গিয়ে সেই দিব্যপুরুষের পা ধরা মাত্রই হরনাথ নিথর নিস্পন্দ। কেটে যায় কয়েকটা মুহূর্ত। সেই পুরুষ এবার হরর হাত থেকে ছাড়িয়ে নেন নিজের পা। তারপর শান্ত গলায় বলেন, হর, তুমি যা ভাবছ আমি সেই দ্বারকানাথ নই।

হরনাথের কিন্তু সে কথা বিশ্বাস হয় না। সে ভাবে তাদের জ্ঞাতিদাদা দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই বুঝি সন্ন্যাসী সেজে ভয় দেখাচ্ছে তাদের। তাই আবারও বলে, দ্বারকাদাদা, ভয় দেখিও না, ঘরে যাও।

যেখানে দাঁড়িয়ে হরনাথ আর শিবনাথ এইসব কথা বলছে, তার একটু দূরেই ছিল তাদের এক দিদি প্রসন্নময়ীর বাড়ি। তিনি বাড়ি থেকে ওদের গলা পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ওরে কি হয়েছে?

হরনাথ বলে, দেখ না দিদি, দ্বারকাদাদা আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।

তারস্বরে 'রাম' 'রাম' করতে করতে প্রসন্নময়ী এগিয়ে এসে বলেন, কোথায় দ্বারকা, সে তো দুমাস হলো বাড়ি নেই। যা-যা তোরা শীগগির যা।

দিদির কথা শুনেই শিবনাথ দৌড় দেয় বাড়ির দিকে। যাবার আগে শুধু বলে, হর, ছুটে আয়।

বাড়ি গিয়েই শিবনাথ মূর্ছা যায়।

ওদিকে প্রসন্নময়ী সেখানে আর কাউকে দেখতে না পেয়ে বাড়িতে গিয়ে সব বলেন। সব শুনে হরর মা ভগবতী দেবী বলেন, উনি নিশ্চয়ই কোনো মহাপুরুষ। এই কথা বলে সেদিন থেকেই তিনি রোজ সেই মহাপুরুষ ভোগের ব্যবস্থা করেন। কয়েকদিন বাদে তাঁর কৃপা হলো। রাতে তিনি ভগবতদেবীকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন, তোমার ছেলে বিশেষ করে হর–বড় সামান্য নয়। ওদের দর্শন দিতেই ওদের পেছনে আমি গিয়েছিলাম। তুমি রত্নগর্ভা। নিশ্চিন্তে থাক, তোমার ছেলেদের কোনো ক্ষতি হবে না।

সত্যিই তাই। এই হরই হলেন বাংলা তথা ভারতের এক বিশিষ্ট সাধক হরনাথ–সবাই যাঁকে বেশি জানে পাগল হরনাথ নামেই। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বাংলা ১২৭২ সালের ১৮ আষাঢ় সোনামুখিতে হরনাথের জন্ম আর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ২৫ মে তিনি দেহত্যাগ করেন।

এনাটমি কি ভাবে এলো

জহর মুখোপাধ্যায়

১৫৩৬ সাল।
ইউরোপের লোভেন শহরের শান্ত নিরুপদ্রব জীবনে একটি উৎপাত শুরু হলো। বেশ কিছুদিন আগেই সেখানে একদল দস্যু এসে আস্তানা গেড়েছিল। খুন-জখম ও লুঠতরাজে তাদের জুড়ি ছিল না। সমস্ত শহর তাদের ভয়ে টুঁ শব্দটি করতো না।

তাদের দলপতি ছিল ভীষণ শক্তিমান। দশাসই চেহারা। দুনিয়ার কোনো কিছুকেই পরোয়া করতো না। সে ছিল যেমন নিষ্ঠুর তেমনি কুটিল। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও তার নাগাল পায়নি। কিন্তু একদিন এক অসতর্ক মুহূর্তে সে ধরা পড়ে গেল। দেশের রাজা ঠিক করলেন, এমন একজন দস্যুর সাজা একটু কঠিন ভাবেই দিতে হবে।

শহরের একপ্রান্তে ছিল জঙ্গলে ঢাকা একটা পাহাড়। সেই পাহাড়ের কোলে সারি সারি অনেকগুলি ফাঁসির মঞ্চ সাজানো। মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত লোকদের ফাঁসি দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাঠানো হতো সেখানে। জায়গাটা একেবারে নির্জন আর ভূতুড়েও বটে। দিনের বেলাতেও কেমন থমথমে ভাব। ফাঁসির দড়িগুলো শূন্যে ঝুলে আছে। কখনো বা অল্প অল্প হাওয়ায় দুলছে। সাধারণ মানুষ বড় একটা যেত না।

সেই দস্যুসর্দারকে এক অভিনব উপায়ে শাস্তি দেওয়া হবে শুনে সারা শহরে সাড়া পড়ে গেল। আর সাজার দিন ঘটনাস্থলে কৌতূহলী মানুষের ভিড় উপচে পড়ল। প্রকান্ড দু'টো ঠেলাগাড়িতে মোটা শেকলবাঁধা বন্দীকে সেখানে আনা হলো।

একটা ফাঁসিকাঠের সঙ্গে শেকল দিয়ে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিচে আগুন জ্বেলে দেওয়া হলো। আগুনের তাপে ধীরে ধীরে জীবন্ত পুড়ে মরছে দস্যুসর্দার, এই তার উপযুক্ত শাস্তি।

দূরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে সবাই দেখল এই ঘটনা। দেখল আর ভাবল, কী ভয়ংকর মৃত্যু!

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন খুব নামডাক। বিশেষ করে ডাক্তারি পড়তে ছাত্ররা আসে দূর দূরান্তর থেকে। এমনি একটি ছাত্র এল বেলজিয়াম থেকে। আর পাঁচজন ছাত্র থেকে এ যেন একটু আলাদা ধরনের। চুপচাপ বসে লেকচার শোনে, অবসর সময়েও ডুবে থাকে বইপত্রের মধ্যে। একটা বিষয়ে কিন্তু ছাত্রটির মন ভরে না। সে সময়ে এনাটমি বিভাগে পড়ানো হতো গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেনের বই। বস্তুত তখন গ্যালেনের বই ছাড়া আর কিছু ছিল না বললেই চলে। গ্যালেনের মতে মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আকৃতি সম্বন্ধে জানতে হলে বানর অথবা কুকুরের দেহ ব্যবচ্ছেদ করা যেতে পারে। এই মতে আস্থা ছিল সকলের। বেলজিয়াম থেকে আসা ছাত্রটির মনে প্রশ্ন জাগে একটা মানুষের দেহের কাঠামো ও অঙ্গ-সংস্থান কি কুকুরের মতো হতে পারে? চাল-চলন, আকৃতি-অবয়ব কোনো কিছুতেই কি উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য আছে? হ্যাঁ, যদি একটা মানুষের কংকাল পাওয়া যেত, তাহলে এ সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা পাওয়া সম্ভব হতো।

ছাত্রটির কথা শুনে সকলে গড়িয়ে পড়ে হাসতে হাসতে। ছেলেটা কি পাগল!

ছাত্রটি কিন্তু এতে দমে গেল না। বরং গ্যালেনের চিন্তাধারা ও পর্যবেক্ষণের উপর তার সন্দেহ আরও তীব্র হলো। সে ভাবে, একটা মানুষের কংকাল যোগাড় করতে পারলে সবাইকে দেখিয়ে দিত তার চিন্তা ও যুক্তি কতটা অভ্রান্ত।

আরও চারটে বছর কেটে গেল। এ এক অসহিষ্ণু প্রতীক্ষা। অবশেষে এল সেই সুযোগ। ছাত্রটি তখন লোভেনে।

বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে কথা বলতে বলতে কখন যে শহর ছেড়ে বহুদূর এসে পড়েছে খেয়ালই ছিল না। যখন খেয়াল হলো দেখল একটু দূরেই সেই পাহাড়ী এলাকা যেখানে অপরাধীদের ফাঁসি দেওয়া হয়। কিছুদূরে দেখা যাচ্ছিল বল্লমের মাথার মতো পাহাড়ের চূড়ো। বন্ধুটি বলল, গা ছমছম করছে, চল ফেরা যাক। কথাটা তার কানেই গেল না। যাবে কি ভাবে, তার মনে তখন অন্য চিন্তা। সে ভাবছে, এখানে খুঁজে দেখলে হয়তো মানুষের হাড়গোড় পেয়ে যেতে পারে। হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল, পেয়েছি, ঐ দেখ। সামনেই দেখা গেল একটা ফাঁসিকাঠের সঙ্গে বাঁধা প্রমাণ সাইজের একটা মানুষের কঙ্কাল।

বন্ধুটি খুব আস্তে আস্তে বললে, মনে হচ্ছে সেই স্যাণ্ডো ডাকাতের কঙ্কাল।

ছাত্রটির মনে তখন উত্তেজনার জোয়ার। আর দেরি নয় একটুও। একলাফে বন্ধুর কাঁধের উপর উঠে সে যতগুলো পারল হাড় আলগা করে খুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি পকেটে পুরল। ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা ভারি বাজখাঁই গলা শোনা গেল—হুঁশিয়ার। কবরখানার গার্ড এগিয়ে আসছে। ওর হাতে একটা জোরাল টর্চ, বন্দুকও আছে সঙ্গে।

সর্বনাশ। আর এক মুহূর্তও নয়। ফাঁসির মঞ্চের উপর থেকে লাফিয়ে পড়েই দৌড়। বিপদমুক্ত এলাকায় পৌঁছে হাঁফাতে হাঁফাতে বন্ধুটি বলল, খুব বেঁচে গেছি, বুঝলে। ধরা পড়লে কি হতো বলো দেখি।

চুরি করা হাড়গুলি পরখ করতে করতে ছেলেটি বলল, হুঁ, তাই তো—

দূরে দাঁড়িয়ে সবাই দেখল আর ভাবল কী ভয়ঙ্কর মৃত্যু!

–তাই তো মানে, তোমার দেখছি আমার কথাটা গায়েই লাগল না। যাক্ এবার আমি চললাম। যা ভাল বোঝ কর। তবে মনে রেখ ঝুঁকি বারবার নেওয়া ঠিক নয়। কপাল মন্দ হলে ধরা পড়ে যাবে।

ছাত্রটির মনে তখন আর এক মতলব খেলছে। সে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, মনে থাকবে।

–তা হলে চলি, শুভরাত্রি।

বন্ধু চলে যাবার পর কিছুক্ষণ ছাত্রটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে কি ভাবল। অনেক দূরে পাইন গাছের মাথার ওপরে আধখানা চাঁদ। চাপ চাপ কুয়াশা জমছে। ল্যাম্পপোস্টের আবছা আলো দৃষ্টিকে আরও বিভ্রান্ত করছে। গায়ে যেন চাবুক মেরে এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া বয়ে গেল। ছেলেটি গায়ের জামা ঠিক করে নিল, বুকের বোতাম আটকে নিল। তারপর ফাঁকা মাঠের মধ্যে দৌড়– আর দৌড়। আগুপিছু তাকাবার সময় নেই। একটু পরেই পৌঁছে গেল সেই পাহাড়ের কাছে। ফঁসিকাঠে বাঁধা কঙ্কাল হাওয়ায় অল্প অল্প দুলছে। কাঠবেড়ালির মতো সে তরতর করে খুঁটির মাথায় পৌঁছে গেল। একটু চাপ দিতেই পোকায় কাটা খুঁটি মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। কিন্তু মুশকিল হলো এত বড়ো কঙ্কাল বয়ে নিয়ে যাবে কিভাবে! তাই কিছু হাড়গোড় সে আলগা করে নিল সেটা থেকে। বাকিটুকু এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে গেল। তারপর একটু একটু করে তিন রাতের মধ্যে সম্পূর্ণ কঙ্কালটাই চুরি করে নিয়ে এল। এরপর দুদিন ধরে খুব সন্তর্পণে তার দিয়ে হাড়গুলো জোড়া লাগিয়ে সম্পূর্ণ কঙ্কাল সাজিয়ে ফেলল।

এই যুবকটির নাম এখন পৃথিবীর সকলেই জানে– ডাক্তার অ্যান্ড্রিয়া ভেসালিয়াস। ইউরোপের ব্রাসেলসে সম্ভ্রান্ত ফ্লেমিশ বংশে ১৫১৪ সালে এঁর জন্ম। প্রথম জীবনে ব্রাসেলসের এক সাধারণ স্কুলে, পরে লোভেন ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছিলেন।

চুরি করে আনা সম্পূর্ণ কঙ্কালটিকে এক নজর দেখেই ভেসালিয়াস বুঝেছিলেন মানবদেহ সম্বন্ধে এতদিনের ধারণায় অনেক গলদ আছে। নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি তাঁর গবেষণার ফলাফল বোঝাতে লাগলেন। এই বিষয়ে কয়েকখানা ছবিও তিনি দেখালেন। কিন্তু কথায় বলে, শয়তানের কারসাজিতে ভগবানের পরিকল্পনাও বানচাল হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। ভেসালিয়াসের বক্তৃতা শুনে অনেকেই খাপ্পা হয়ে গেলেন। বিশেষ করে গ্যালেনের মতাবলম্বীরা তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়াল। বিদ্রূপ আর লাঞ্ছনার শিকার হলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত প্যারিসে বাস করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল। অনেক দুঃখে তিনি চলে এলেন ইতালীতে। ইতালীর পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ীভাবে পড়াশুনো ও গবেষণা চালিয়ে যেতে লাগলেন। মাত্র তেইশ বছর বয়সে ১৫৩৭ সালে পাঁদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এনাটমি বিভাগের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হলেন ভেসালিয়াস।

ভেসালিয়াসের একটা বিশেষত্ব ছিল, তিনি নিজের হাতেই শব-ব্যবচ্ছেদ করতেন। তারপর সেগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতেন। এমনকি অধ্যাপক হয়েও তিনি সেই অভ্যাস ছেড়ে দেননি। এর আগে অধ্যাপকেরা উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে বই খুলে নির্দেশ দিতেন আর ডোমরা সেই ভাবে শব-ব্যবচ্ছেদ করতো। কদাচিৎ দু একজন ডাক্তার নিজের হাতে শব-ব্যবচ্ছেদ করতেন। ভেসালিয়াস এই প্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন।

পাদুয়ায় অধ্যাপনা আর গবেষণার ফাঁকে ফাঁকে ভেসালিয়াস তাঁর আর একটি পরিকল্পনাকে রূপ দিতে থাকেন, লিখতে থাকেন এনাটমির একটি বই। ছোট বড় অনেক বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে ১৫৪৩ সালে প্রকাশিত হলো, তাঁর বই–'ডি ফ্যাব্রিকা করপোরিস হিউম্যানি'। ভেসালিয়াসের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ক্যালকার এই বই-এর ছবি এঁকে দিয়েছিলেন। চারদিকে রাতারাতি সাড়া তুলে দিয়েছিল ঐ বই। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় শুরু হলো–সূচিত হলো আধুনিক এনাটমির জয়যাত্রা।

কিন্তু এরই মধ্যে এমন একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটল যার ফলে ভেসালিয়াসের গবেষণার ছন্দপতন হলো।

বই প্রকাশের কাজে ভেসালিয়াস ব্যামেলে যাবার সময় এক ছাত্রকে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে বলেছিলেন। ফিরে এসে দেখলেন তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগে ষড়যন্ত্র করে সেই ছাত্রটিকে তাঁরই জায়গায় অধ্যাপক করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভেসালিয়াস তো হতবাক। কর্তৃপক্ষের কাছে এর কারণ জানতে চাইলে তাঁকে কেউ আমলই দিল না।

সেদিন অপমানে লজ্জায় দুঃখে তিনি স্থির করলেন, না, আর নয়। প্রয়োজন নেই মানুষের কল্যাণসাধনের জন্য জীবন উৎসর্গের, তার চেয়ে বরং টাকা রোজগার করাই ভাল। সম্রাট চার্লসের ব্যক্তিগত চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হলেন ভেসালিয়াস। সম্মান অর্থ দুটোই প্রচুর পরিমাণে পেলেন। সব থেকে বেশি আশ্চর্যের বিষয় এই যে যিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য ভাস্বর ছিলেন তিনিই রাজার চাটুকারিতায় সকলকে টেক্কা দিয়ে

অনুবাদ সিরিজ

আলেকজাঁন্দ্রে দুমার
কাউন্টেস দ্য চার্নি
দ্য কনস্পিরেটর্স

রবার্ট লুই স্টিভেনসনের
দি বটল ইম্প

মেরী শেলীর
ফ্রাঙ্কেনস্টিন

চার্লস ডিকেন্সের
গ্রেট এক্সপেক্টেশনস
নিকোলাস নিকোলবি

মার্ক টোয়েনের
এ কানেক্টিকাট ইয়্যাংকি ইন্ কিং আর্থার্স্ কোর্ট
পাডনহেড উইলসন

ভিক্টর মারি হ্যুগোর
দি ম্যান হু লাফ্স

লী ওয়ালেসের
দ্য ফেয়ার গড্

জুলে ভার্নের
লাইটহাউস

চার্লস কিংসলির
হাইপেশিয়া

জর্জ এলিয়টের
মিডল মার্চ
সাইলাস মার্নার

এইচ. জি. ওয়েলসের
দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন
দ্য ওয়ার অব দ্য ওয়ার্লডস

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা ৯

গেলেন। একজন প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিকের অপমৃত্যু হলো এইভাবে।

এরপর আরও অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। গ্যাব্রিল ফেলোপিয়াস নামে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়েরই একজন অধ্যাপক ভেসালিয়াসের বইটির প্রচুর সুখ্যাতি করে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। ডাক্তার ও ছাত্রমহলে আবার নতুন করে সাড়া পড়ে গেল। গ্যালেনের গোঁড়া অনুসারীদের প্রতিবাদ আর কানে তুললেন না কেউ। পড়াশুনা আর গবেষণার কাজে বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠল ভেসালিয়াসের বই।

পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরও এবার টনক নড়ল। সত্যি তাঁরা কী অন্যায়ই না করেছেন। তাঁরা আবার অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য ভেসালিয়াসকে আমন্ত্রণ জানালেন।

পাদুয়া! জীবনসাধনার শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান! ভেসালিয়াসের এতদিনের পুঞ্জীভূত অভিমান যেন নিমেষে দূর হয়ে গেল। রাজার সভাসদ হয়ে যদিও অনেক টাকা রোজগার করেছেন তবু বিজ্ঞানীর মন বারেবারেই ছকে বাঁধা জীবনের গন্ডি পেরিয়ে উধাও হতে চেয়েছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সাদর আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেন না তিনি। রওনা হলেন পাদুয়ার দিকে।

ভেসালিয়াসের জাহাজ চলেছে পাদুয়ার দিকে। পথে আইওয়ান সাগরে জান্তে দ্বীপের পাথুরে উপকূলের কাছে এক ভয়ংকর ঝড়ের মুখে পড়লেন তাঁরা। চুরমার হয়ে গেল জাহাজ। একজন যাত্রীও প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলেন না।

এর কয়েক মাস পরে তীর্থযাত্রীদের একটি জাহাজ হঠাৎ এসে থামল জান্তে দ্বীপে। দ্বীপে নেমে যাত্রীরা দেখলেন চারদিকে ছড়ানো ছিটানো অনেক মানুষের কংকাল। একটা কংকালের দিকে ঝুঁকে পড়ে একজন বললেন, এটা নিশ্চয়ই ভেসালিয়াসের। এই সিদ্ধান্তের কারণ কংকালটির পাশে পড়েছিল একটা জীর্ণ বই। অস্পষ্ট হলেও নামটা পড়া যায়–

যাত্রীরাই উপকূল থেকে একটু দূরে একটা উঁচু জায়গায় কবর খুঁড়ে শুইয়ে দিলেন কংকালটিকে, তার পাশে আড়াআড়ি করে রেখে দিলেন একটা ক্রশ।

সন্ধ্যার আগেই জাহাজ আবার রওনা হলো। যাত্রীরা ডেকের উপর দাঁড়িয়ে টুপি খুলে শেষ অভিনন্দন জানালেন আধুনিক এনাটমির জনক ভেসালিয়াসকে।

ছবিঃ তরুণ চক্রবর্তী

জাতিস্মর

অণিমা মুখোপাধ্যায়

ছোটবেলা থেকেই অর্ণব একটু ভাবুক প্রকৃতির। আনমনে বসে বসে কি যেন ভাবতো আর হঠাৎ হঠাৎ এক একটা অদ্ভুত কথা বলে বসতো। বন্ধুরা তাই অর্ণবকে নিয়ে খুব মজা পেতো। কেউ কেউ আবার বলতো, ছেলেটার মাথায় বোধহয় ছিট আছে। এমনি একটা অদ্ভুত কথা একদিন অর্ণব বলেছিল তার মাকে। মা তখন সবে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালছেন, অর্ণব মায়ের কাছে এসে বলল, জানো মা, আমার আগের মা না, খুব সুন্দর দেখতে ছিল। মা একটু চমকে গিয়ে ওর মুখের দিকে তাকালেন, বললেন, সে আবার কি ? তবে আমি তোর কে ? অর্ণব বলল, কেন, তুমিও আমার মা। মা এবার ধমক দিলেন, যত সব অনাসৃষ্টির কথা। সন্ধ্যে হয়েছে, যা পড়তে বোস গিয়ে। মা ওর কথায় কোনো গুরুত্বই দিলেন না দেখে অর্ণবের মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সেই অর্ণব এখন বড় হয়েছে। কলেজে পড়ছে। এখন কেবল টায়রার সংগেই ওর যা কিছু কথাবার্তা। কারণ টায়রা ওর সব কথা মন দিয়ে শোনে। ও যখন বলে, ওর আগের মায়ের একটা খুব সুন্দর সীতাহার ছিল কিংবা যখন বলে, ওদের সেই বাড়িটা খুবই কাছে—একদিন সে টায়রাকে সেখানে নিয়ে যাবে—তখন টায়রা একটুও হাসে না।

টায়রা ভাবে, অর্ণব কি ওর আগের জন্মের কথা বলে ? নিশ্চয়ই তাই। ও তো বাজে কথা বলার ছেলে নয়।

অর্ণবদের বি. এ. পরীক্ষার মাস চারেক পরের কথা। টায়রার বিয়ে হয়ে গেছে। আজ বৌভাত। টায়রার যে সব বন্ধুরা ওর বিয়েতে গিয়েছিল তারা সকলেই এসেছে বৌভাতে। ফুল দিয়ে সাজানো একটা চেয়ারে বসে টায়রা গল্প করছিল বন্ধুদের সংগে। ঝলমলে শাড়ি আর গয়না পরে ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। বিশেষ করে হীরের লকেট দেওয়া সীতাহারটার দিকে নজর পড়ছে সকলেরই।

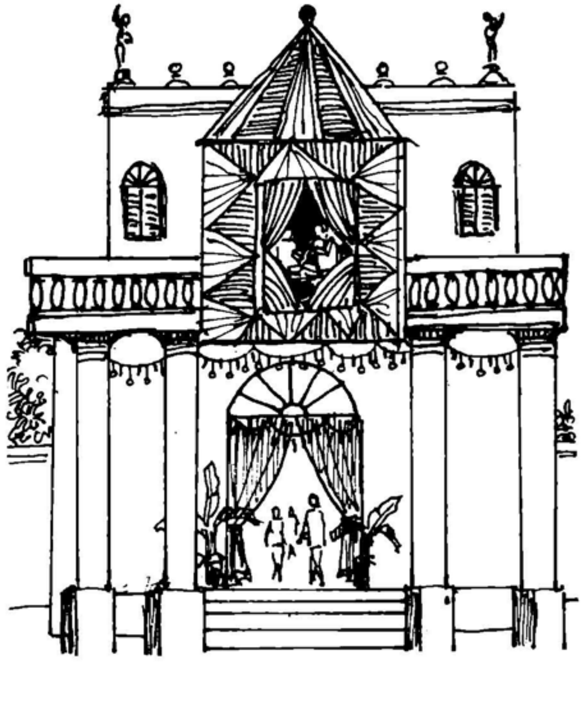

এত হৈচৈ-এর মধ্যেও টায়রা একটু অন্যমনস্ক, কারণ অর্ণব এখনও আসেনি। বন্ধুদের কাছে অনেকবার ও অর্ণবের খোঁজ নিয়েছে। বন্ধুরা বলেছে, যা ছিটগ্রস্ত ছেলে, কে জানে আসবে কিনা।

এদিকে অর্ণব তখন সেই বাড়িতে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কি যেন দেখছে। বাড়িটা খুব সুন্দর আলোয় ও ফুলে সাজানো তাই-ই হয়তো দেখছে। চারদিক দেখতে দেখতে অর্ণব বাড়ির ভেতর ঢোকে। যে হলঘরটায় টায়রাকে বসানো হয়েছে সে ঘরে ঢুকে ও যেন আরও ভালো করে চারদিক দেখে। আচ্ছা, ঐ যে বড় তৈলচিত্রটা, ওটা তো স্বর্ণেন্দ্রনাথের ঠাকুরদার। পাশেরটা কাকা দ্বীপেন্দ্রনাথের। এরপরে অর্ণব টায়রার সামনে এসে অবাক চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। টায়রা হেসে বলে, কি হলো অর্ণব, আমাকে চিনতে পারছো না ?

টায়রার কথায় অর্ণবের চমক ভাঙে। সে আমতা আমতা করে বলে, তোমাকে ঐ সীতাহারটা পরে খুব সুন্দর লাগছে।

টায়রা বলে, এটা আমার শ্বশুরমশাই আমাকে দিয়েছেন।

কিন্তু তার কথা অর্ণবের কানেও যাচ্ছে না। এই সীতাহারটা তার খুব চেনা লাগছে। সীতাহারের মাঝখানে সে টায়রার মুখ দেখতে পায় না, দেখতে পায় তার মায়ের মুখখানি। তার

আগের জন্মের মা। মনে পড়ে যখন তার বয়স তেরো কি চোদ্দ তখন মাকে ঐ হারটা পরতে দেখেছে।

অর্ণবের হাবভাব টায়রার ভালো লাগে না। সে বলে, অর্ণব, তোমার আজ কি হলো, ঐ রকম ভাবে চারদিক দেখলে এ বাড়ির লোকেরা কি মনে করবে বল তো?

তার কথায় অর্ণব ভ্রূক্ষেপও করে না। সে ঘর থেকে বেরিয়ে বাড়ির চারিদিকে ঘুরতে থাকে। ঘুরতে ঘুরতে সব মনে পড়ে যায়। ঐখানে বসে মা আনাজ কুটতেন। সামনে রান্নাঘর। ঘরটা তখন বিরাট ছিল। এখন দুখানা হয়েছে। সোজা বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে অর্ণব থমকে দাঁড়ায়। সামনে আর একখানা ঘর। ঐ ঘরে যখন আগাগোড়া ফ্রেসকোর কাজ হয়, তখন সে দাঁড়িয়ে দেখতো। স্বর্ণেন্দ্রনাথ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করাতেন। একে একে আরও অনেক কিছু মনে পড়ে। দাদু যতদিন ছিলেন ততদিন তার কত আদর ছিল। কিন্তু দাদু মারা যাওয়ার পর কাকা ওদের সংগে ভাল ব্যবহার করতেন না। সংসারের সব কাজ মাকে দিয়ে করাতেন। মার কত কষ্ট হতো! ওর বাবাও দাদু মারা যাওয়ার পরেই মারা যান।

ও মা! সেই সিন্দুকটা ঠিক সেই জায়গাতেই আছে। সিন্দুকটার সামনের দিকে 'এস' চিহ্নটা আবছা দেখা যাচ্ছে। দাদুর নামের প্রথম অক্ষর।

অর্ণব এবার সিঁড়ি দিয়ে ছাদে ওঠে। সেই প্রকান্ড ছাদ। পাঁচিলটা জায়গায় জায়গায় ভেঙে গেছে। এইখান দিয়েই তো মা স্বর্ণময়ী দুঃখকষ্টের জ্বালা-যন্ত্রণা সইতে না পেরে লাফিয়ে পড়েছিল। সে সেই সময় পেছনে এসে পড়েছিল। মাকে ঐ অবস্থায় দেখে সে চিৎকার করে উঠেছিল। তারপর পাঁচিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে দেখতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল তিনতলার এই ছাদ থেকে।

আজও তার চিৎকারে সবাই ছুটে আসে, বলাবলি করে, কে ছেলেটা? একজন ওকে প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিল, সেই এগিয়ে এসে বলে, তোমার নামটা কি বল তো?

সপ্তর্ষি—অর্ণব বলে।

লোকটি অবাক হয়ে বলে, সপ্তর্ষি! শুনেছি বহুকাল আগে সপ্তর্ষি নামে এ বাড়ির এক ছেলে—

তার কথা শেষ হবার আগেই অর্ণব বলে ওঠে, আমিই সে। এই বাড়িতে যারা ছিল, কত কষ্ট তারা দিয়েছে আমার মাকে।

অর্ণবের কথা শুনে সকলে অবাক হয়ে যায়। বলে কি ছেলেটা! কোথা থেকে এ খবর শুনে এসেছে, আবার বলছে, আমিই সপ্তর্ষি! ধাপ্পা দেবার আর জায়গা পায়নি।

ঠিক এই সময় টায়রার স্বামী অনিল সেখানে এসে পড়ে। সব শুনে অবাক হয়ে যায় অনিলও। অর্ণবকে সে ডেকে নিয়ে যায় তার বাবার কাছে।

টায়রার শ্বশুরমশাই অর্ণবকে প্রশ্ন করেন—তুমি কে?

বলেছি তো সপ্তর্ষি, কতবার আর এক কথা বলবো? অধৈর্য হয়ে উঠে অর্ণব বলে, ঐ তো আমার দাদু স্বর্ণেন্দ্রনাথ, আর ঐ যে দ্বীপেন্দ্রনাথ।

উনি কি তোমার কাকা?

কাকা! কাকা বলতে আমি ঘৃণা বোধ করি। ওরই জন্যে আমার মা শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছিলেন। অর্ণব এবার কেঁদে ফেলে।

টায়রার শ্বশুর অর্ণবের কথায় আশ্চর্য হয়ে যান। সত্যিই তো, এমন ঘটনা ঘটেছিল এই বাড়িতে তাঁরা শুনেছেন। আর স্বর্ণেন্দ্রনাথ দ্বীপেন্দ্রনাথ তো ওঁর বাবার ঠাকুর্দা ও কাকার নাম।

এদিকে সারা বাড়িময় ছড়িয়ে গেছে এই সব কথা। টায়রাও ছুটে এসেছে। তার গলার সীতাহারটা দেখে হিংস্র শ্বাপদের মতো জ্বলে ওঠে অর্ণবের চোখ দুটো। চিৎকার করে ওঠে সে, ঐ তো, ঐ সীতাহারটা আমার মায়ের। দাও, খুলে দাও এখনি।

টায়রা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়, বলে, কি বলছো অর্ণব, এটা তো বাবা আমাকে দিয়েছেন।

অর্ণব বিদ্রূপ করে বলে, কোথায় পেলেন তোমার শ্বশুরমশাই? ঐ দ্বীপেন্দ্রনাথ ওটা চুরি করেছিল দাদুর ঐ সিন্দুক থেকে। আমার মায়ের নাম ছিল স্বর্ণময়ী। ঐ হারের লকেটে এখনো 'এস' চিহ্ন আছে দেখো।

টায়রা হীরের ফুলটা ভালো করে দেখে। সত্যিই 'এস' চিহ্ন রয়েছে। অর্ণব ঠিকই বলেছে।

অর্ণবের চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে। সে বলতে থাকে, ছাদ থেকে পড়ে যাবার পর সেদিন মা আর আমি দুজনেই হাসপাতালে গেলাম। সেখানে দুদিন ছিলাম। মা চলে যাবার আগের দিন কত আমায় আদর করল। মা আমায় বলে গেল, সপ্ত, আমি যাচ্ছি, আমার সংগে তুইও আয়। ঐ বাড়িটা অভিশপ্ত। ওখানে আর আমাদের থাকার জায়গা নেই বাবা। সেদিন পড়ে যাওয়ার জন্যে আমার পায়ের আঙুল ভেঙে যায়। এই দেখো টায়রা, এই আঙুলটা এখনো বাঁকা।

যতই শুনছেন টায়রার শ্বশুরমশাই ততই অবাক হয়ে যাচ্ছেন। এবাড়ির যত ঘটনা শুনে এসেছেন ছোট থেকে সব মিলে যাচ্ছে।

এবার টায়রা তার গলা থেকে সীতাহারটা খুলে ফেলে। অর্ণবকে বলে, এই নাও অর্ণব, তোমার মায়ের সীতাহার।

টায়রার কথায় অর্ণব যেন নিজেকে ফিরে পায়। সজল চোখে সে টায়রাকে বলে, না টায়রা, ওটা তোমার গলাতেই থাক। আমি তোমার মুখের ভেতর আমার মায়ের মুখ দেখেছি। তাই তো আমার সব মনে পড়ে গেছে। ওটা তোমার কাছেই থাক। জানব তুমি আমার মায়ের স্মৃতিকে যত্ন করে রেখেছ। শুধু মাঝে মাঝে এসে আমি দেখে যাবো, এইটুকু অনুমতি দাও।

ব্যস্ত হয়ে ওঠেন টায়রার শ্বশুরমশাই, অনুমতি দেব কি? তোমার যখন খুশি আসবে। এ বাড়ির দরজা সবসময় খোলা রইল তোমার জন্যে।

ছবি: সরোজ সরকার

হাতে কলমে

হাওয়া গাড়ি

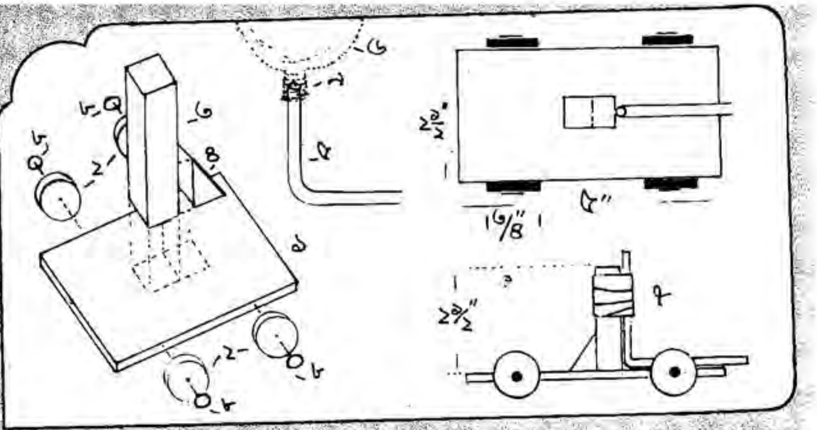

—চোখ আঁকা যেই শেষ করবে রমণীদা, মায়ের মধ্যে প্রাণ পিতিষ্ঠে হবে। ভজুদা ভক্তিভরে কথাগুলো বলতেই ছোড়দা ফোড়ন কাটল, হাঁা, ঠিক আমার এই হাওয়া গাড়ির মতো। এই চাকাগুলো লাগিয়ে, বেলুন ফুলিয়ে কাঁচের পাইপটাতে লাগিয়ে দিলেই গাড়ি চলতে শুরু করবে। ভজুদা রাগে গজগজ করতে করতে উঠে গেল। আমরা আগ্রহ ভরে ছোড়দার দিকে তাকালাম।

ছোড়দার গাড়ির আঁক টানলাম ছবিতে। হিসেব মতো কেটে জুড়ে তৈরি কর।

গাড়ির কলকব্জাগুলো নম্বর হিসাবে লিখলাম, যোগাড় করতে সুবিধে হবে।

১। প্লাইবোর্ড (গাড়ির পাটাতন)
২। ক্যারামের ঘুঁটি (চাকা)
৩। বাটাম (গাড়ির স্ট্যান্ড)
৪। ত্রিকোণ বাটাম (স্ট্যান্ডের ধারক)
৫। কাঁচের পাইপ (ইঞ্জিনের জল)
৬। বেলুন (ইঞ্জিন)
৭। সেলোটেপ
৮। বোর্ড পিন (চাকার অক্ষ)
৯। সুতো

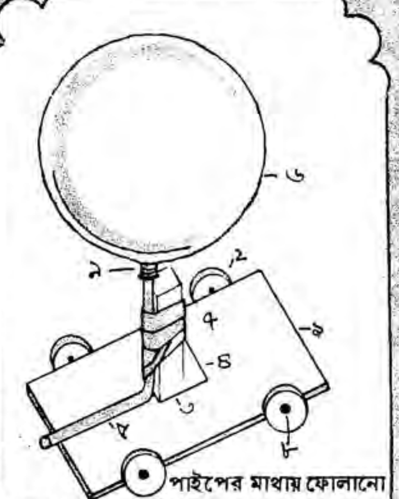

পাইপের মাথায় ফোলানো বেলুন বেঁধে, পাইপটার খোলা মুখ বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে ধরে সমতল জায়গায় ছেড়ে দিলে গাড়ি বাতাসের ধাক্কায় ছুটবে।

গণেশ ঘোষ
মদন মুখোপাধ্যায়

লেখা আছে পুঁথির পাতায়

স্যার আইজ্যাক নিউটনের বল সম্পর্কীয় তৃতীয় সূত্রে আছে—প্রত্যেক ক্রিয়ার এক সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে এবং এই বল যে দিকে ক্রিয়া করে প্রতিক্রিয়া তার বিপরীত দিকে হয়। এখানে বেলুনের বাতাস বেলুন থেকে পাইপ দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় গাড়ির পেছনদিকে যে ধাক্কা বা বলপ্রয়োগ করছে তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে গাড়ি সামনের দিকে ছুটছে। রকেট বা অন্তরীক্ষ যান ঠিক এই নিয়মেই পৃথিবীর গন্ডি ছাড়িয়ে পাড়ি দেয় মহাকাশে।

দেখা যায় নাকো তারে
তবু দেয় চাপ,
প্রতি সেমি সেমিতে
এক কেজি মাপ।

—বায়ুমন্ডল

শব্দশৃঙ্খলা

এবারের শৃঙ্খল সংখ্যা ধরে। সূত্র ধরে সংখ্যাগুলো পরপর তৈরি করে যাও, এমন ভাবে যেন এক ঘরে দুবার যেতে না হয়। আর কোনাকুনি যাবার কোনো দরকার নেই।

→

৯	০	২	১
৫	০	৯	১
১	৬	০	২
৫	৭	৩	০

সূত্র:

১। পৃথিবীর ওপর বায়ুমন্ডলের উচ্চতা _ _ _ কি.মি.
২। এই বায়ুমন্ডলের ওজন _ ×১০ _ _ টন
৩। সাধারণ বায়ুমন্ডলের চাপ _ _ _ মি.মি. পারদ স্তম্ভের চাপের সমান।
৪। জলের ক্ষেত্রে বায়ুমন্ডলের চাপ _ _ ফুট জলস্তম্ভের চাপের সমান।
৫। বাতাসের মধ্যে যে অক্সিজেন আছে তা হলো শতকরা – – ভাগ
৬। সাধারণ বায়ুমন্ডলের চাপে বাতাসের ঘনত্ব _ _ _ গ্রাম প্রতি লিটার প্রায়।

উত্তর:- ১।৯০০, ২।৫×১০[১৫], ৩।৭৬০, ৪।৩০, ৫।২১, ৬।১.২৯

অঙ্ক জগতের জাদু

জাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র)

ম্যাজিক ট্রামের যাত্রী

জাদুকর দর্শকদের একজনকে তাঁর দুটো হাত টেবিলের ওপর রেখে বললেন, "ভাবা যাক এটা একটা ট্রাম গাড়ি। ট্রামের সীটে সাধারণতঃ দুজন করে যাত্রী বসেন সেজন্য এই হাতের পাতা দিয়ে তৈরি ট্রাম গাড়ির প্রতিটি আঙ্গুলের ফাঁককে সীট ভেবে আমি দুজন দুজন করে যাত্রী বসাচ্ছি।" এই কথা বলে তিনি ছবি অনুযায়ী প্রতিটি আঙ্গুলের ফাঁকে দুটো করে তাস গুঁজে দিলেন। আর তারপর সবচেয়ে শেষ জোড়া থেকে একটা তাস ফেরৎ নিয়ে বললেন– "ধরা যাক এই সীটটাতে দুজনের বদলে মাত্র একজন বসে আছেন। অর্থাৎ ট্রামের প্রতিটি সীটে জোড়ায় জোড়ায় যাত্রী বসে আছেন কিন্তু এই শেষ সীটটাতে বসে আছেন মাত্র একজন।" জাদুকর তারপর বললেন, "ধরা যাক ট্রামটা অনেক দূরের পথে পাড়ি দিয়েছে এবং নতুন আর কেউ এই ট্রামে উঠছেনও না, নামছেনও না। একা একা দূরপাল্লায় পাড়ি দিতে কারুরই ভাল লাগে না। সুতরাং ওই শেষের সীটের ভদ্রলোক খুবই একা একা বোধ করছেন। কিন্তু নতুন কেউ উঠছেন না বা কেউ জোড়া ভেঙ্গে নামছেন না বলে এই ভদ্রলোক তার পার্টনার হিসেবে কাউকেই পাশে বসাতে পারছেন না। অন্য সীটের কোনও যাত্রীকেও তিনি পাশে আনতে পারছেন না কারণ তাতে তাঁর পার্টনার রাজী হচ্ছেন না–তিনি একা হয়ে যাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি ম্যাজিকের শরণাপন্ন হলেন। ম্যাজিক করে অদৃশ্যভাবে যদি কারুর পার্টনারকে তুলে এনে পাশে বসানো যায় তাহলে তো সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে। তা যাই হোক কীভাবে ম্যাজিকটা হয়েছিল সেটাই দেখাচ্ছি।" আঙ্গুলের ফাঁক থেকে এক জোড়া তাসকে তুলে জোড়া ভেঙ্গে দু জায়গায় আলাদা আলাদা করে রেখে বললেন–"এরা সঠিক জোড়া হিসেবে আছে।" তারপর দ্বিতীয় আর এক জোড়া তুলে নিয়ে তার থেকে তাস দুটোকে ওই আগে রাখা তাস দুটোর ওপর আলাদা আলাদা করে রেখে বললেন–"এরাও জোড়ায় জোড়ায় আছে।" তারপর আর একটা জোড়াকে তুলে নিয়ে ওই আগের তাসগুলোর ওপরে আলাদা আলাদা করে রেখে বললেন–"এরাও জোড়া হিসেবে রয়েছে।" এভাবে সবকটা জোড়া তাসকে তিনি আলাদা আলাদা করে রেখে জোড়া জোড়া বুঝিয়ে দুই ভাগে ভাগ করলেন। সবার শেষে ওই 'নিঃসঙ্গ যাত্রী' বা জোড়া ছাড়া তাসটাকে নিয়ে বললেন– "দেখতেই তো পেলেন–অন্যান্য সব তাস জোড়ায় জোড়ায় রয়েছে কিন্তু এই ভদ্রলোকই রয়েছেন শুধু একা। এখন আপনারা বলুন, এই দুই ভাগের মধ্যে এনাকে কোন ভাগে রাখবো?" দর্শকেরা কোনও একটা ভাগকে পছন্দ করে দেখালেন। জাদুকর তখন ওই নিঃসঙ্গ তাসটাকে সেই ভাগে রেখে বললেন–"ইনি এই ভাগে ঢুকলেন, কিন্তু জোড়ার হিসেবে এখনও সম্পূর্ণ অতিরিক্ত হয়ে আছেন–সুতরাং ম্যাজিক করে ওনাকে অন্য ভাগ থেকে অদৃশ্যভাবে একজন 'বন্ধু' জুটিয়ে দেওয়া যাক।" তারপর জাদুর ভঙ্গিমায় হাত নেড়ে এমন অভিনয় করলেন যেন একটা তাসকে অদৃশ্যভাবে তিনি অন্য ভাগ থেকে সেই ভাগে চলে আসতে বলছেন। তারপর বললেন–"হ্যাঁ, একটা তাসকে ওদিক থেকে অদৃশ্যভাবে আমি এদিকে এনেছি....কেউই সেটা দেখতে পান নি...আপনারাও পান নি। কিন্তু প্রমাণ হিসেবে এই ভাগের

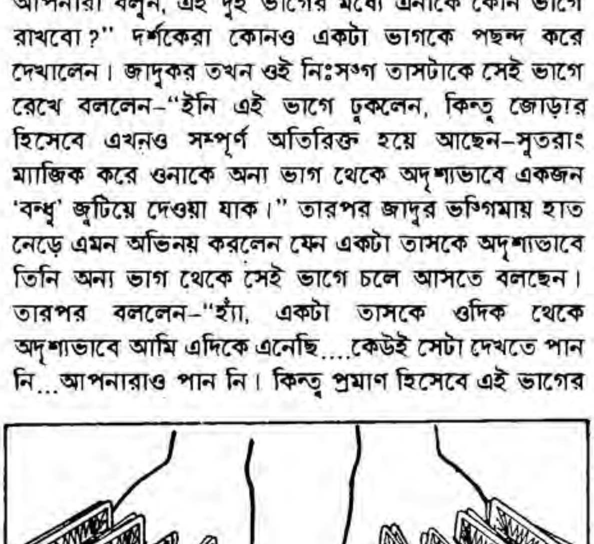

তাসের জোড়াগুলোকে মিলিয়ে দেখা যাক।" সেই ভাগের সবকটা তাসকে তিনি হাতে তুলে দুটো দুটো করে জোড়া হিসেবে টেবিলে রেখে দেখালেন—সব কটা তাসই জোড়ায় জোড়ায় হয়ে গেছে। অর্থাৎ আমাদের নিঃসঙ্গ যাত্রীও একজন জুটী পেয়ে গেছেন। ওদিকে অন্য ভাগের তাসগুলোকে দুটো দুটো করে জোড়া হিসেবে রাখতে গিয়ে দেখা গেল—তাদের শেষ তাসটার কোনও জোড়া নেই। তার সাথী যেন ম্যাজিকের বলে অদৃশ্য হয়ে আগের অংশে চলে গেছে! সে হয়ে গেছে একদম একা।

খুব চমকদার হলেও এটা কিন্তু ভীষণ সহজ ম্যাজিক। এর মধ্যে হিসেবের একটা মারপ্যাঁচ তো আছেই—কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, জাদুকরকে সেই হিসেবটা মোটেই করতে হয় না, তাসগুলো তাদের ভাগাভাগির হিসেবটা নিজেরা নিজেরাই করে নিয়েছে। গল্পচ্ছলে দেখাবার জন্য সেই হিসেবটা দর্শকদের নজরে আসেনি। ব্যাপারটা হলো, দু হাতের প্রতিটি আঙ্গুলের ফাঁকে জোড়ায় জোড়ায় তাস ছিল। শুধু শেষ আঙ্গুল দুটোর ফাঁকে ছিল জোড়া ছাড়া তাসটা। অর্থাৎ ওখানে মোট সাতজোড়া তাস এবং একটা জোড়া-ছাড়া তাস ছিল। ওই জোড়া তাসগুলোকে হাতে তুলে জাদুকর যখন সেগুলোকে আলাদা আলাদা করে রাখছিলেন—তখন মুখে 'এরা জোড়ায় আছে' ইত্যাদি বললেও আসলে তিনি জোড়াগুলো ভেঙে দুটো ভাগ করেছেন। সবকটা জোড়াকে এভাবে ভেঙে দুভাগ করলে এক এক ভাগে মোট সাতটা করে তাস থাকছে। এবার ওই নিঃসঙ্গ তাসটাকে এই দুই ভাগের যে কোনও একটা অংশে রেখে দিলে—সেই ভাগে মোট আটটা তাস অর্থাৎ চার জোড়া তাস হয়ে গেল। আর অন্য ভাগের সাতটা তাসকে জোড়া জোড়া হিসেবে ভাগ করলে দেখালে তিন জোড়া এবং একটা নিঃসঙ্গ তাস তো দেখাবেই। গল্পের ছলে তাসগুলো না গুনে শুধু, একটা জোড়া, এটাও জোড়া, এও জোড়া ইত্যাদি বলে খেলাটা দেখালে কেউই এর আসল রহস্যটা নজর করবেন না। সবাই ভাববেন সত্যি সত্যি ম্যাজিক করেই বোধহয় জাদুকর এক ভাগ থেকে অন্য ভাগে তাসটাকে নিয়ে গেছেন।

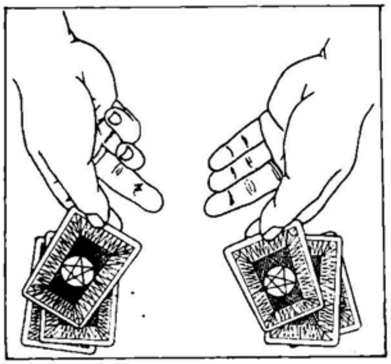

[চলবে]

এ.টি. দেব প্রণীত অভিধান

ENGLISH TO BENGALI

Students' Favourite Dictionary	Rs. 40.00
Dev's Concise Dictionary	Rs. 25.00
Pocket Dictionary	Rs. 17.50
Midget Dictionary	Rs. 7.00

BENGALI TO ENGLISH

Students' Favourite Dictionary	Rs. 40.00
Dev's Concise Dictionary	Rs. 25.00
Pocket Dictionary	Rs. 17.50
Midget Dictionary	Rs. 7.00

শব্দবোধ অভিধান টা. ৪০.০০

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলি-৯

রূপোর নদী

অনিল ভৌমিক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফ্রান্সিস দ্রুত পাহাড়ের মাথা থেকে নামতে লাগল। হঠাৎ খোঁদল থেকে পা পিছলে গেল। পড়তে পড়তে ও টাল সামলাল। উত্তেজনায় ওর সারা শরীর তখন কাঁপছে। ও সাবধান হলো। মাথা ঠান্ডা করে আস্তে আস্তে নামতে লাগল।

নীচে নেমেই ডাকল–'হ্যারি, শিগগির এসো।' ও ছুটল রাজবাড়ির দিকে। পেছনে হ্যারিও ছুটল।

রাজবাড়ির সামনের চত্বরে তখন বিচারসভা বসেছে। মোকা কোহালহো গায়ে দিয়ে কাঠের সিংহাসনে বসে আছে। সামনে একদল ইকাবো দাঁড়িয়ে আছে।

ফ্রান্সিস ছুটে গিয়ে মোকার সামনে দাঁড়াল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল–'মোকা-এখন তোমার বিচারসভা বন্ধ কর জরুরী কথা আছে।'

'কী ব্যাপার ফ্রান্সিস?' মোকা বেশ আশ্চর্য হলো।

'বলছি। তুমি ইকাবোদের যেতে বল।'

মোকা ওদের ভাষায় কিছু বলল। ইকাবোরা মোকাকে মাথা নুইয়ে সম্মান জানিয়ে চলে গেল।

ফ্রান্সিস বলল–'মোকা–তোমার গায়ের কোহালহোটা সিংহাসনের ওপর মেলে দাও। ভাঁজ খুলে।'

মোকা আরো আশ্চর্য হলো। তবু ফ্রান্সিস বলছে। কাজেই কোনো কথা না বলে গলায় নারকেলের দড়ি দিয়ে বাঁধা কোহালহোটা খুলে সিংহাসনের ওপর মেলে দিল। সেই নক্সার ছবিটা। কঙ্কাল পাহাড়ের মাথা থেকে ফ্রান্সিস ঠিক এই ছবিটাই দেখেছে। শুধু দুটো জিনিস নেই। গিয়ানির মন্দিরের একটা থাম আর ডানদিকের নদীর ধারাটা। একটা থাম পাঙ্কোরা চুরি করে নিয়ে গেছে ফ্রান্সিস বলল–'দেখ তোমরা, আমি ছবির নক্সাগুলোর নাম দিচ্ছি। তাহলেই বুঝতে পারবে।'

ফ্রান্সিসের দেওয়া নাম নিয়ে ছবির নক্সাটা দাঁড়াল এরকম ঃ–

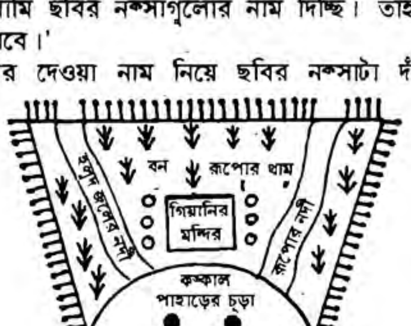

হ্যারি আর মোকা ঝুঁকে পড়ে নক্সা-ছবিটা মনোযোগ দিয়ে দেখল। হ্যারি বলল–'কিন্তু রূপোর নদী কোথায়?'

ফ্রান্সিস হাসল। বলল–'ডানদিকে যে নদীটা চলে গেছে দেখ ওটা সাদা রঙে আঁকা। ওটাই রূপোর নদী।'

'কিন্তু কোনো নদীই তো ওদিকে নেই।'

'অতীতে ছিল। ভূমিকম্পে বা প্রাকৃতিক কোনো বিপর্যয়ে সেই নদীর উৎসমুখ বন্ধ হয়ে গেছে।'

'এখন কী করবে?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

'সেই উৎসমুখটা খুলে দিতে হবে। তার জন্যে সকলের সাহায্য চাই। আমরা আর ইকাবোরা মিলে সেই উৎসমুখ খুলে দেব।'

মোকা বলল–'কিন্তু সেই নদী থেকে কি রূপো পাওয়া যাবে?'

'নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।' ফ্রান্সিস বলল। তারপর হ্যারির দিকে ফিরে বলল–'হ্যারি চলো। কঙ্কালের বাঁ চোখের কাছে পশ্চিমদিকে যে ধস দেখা যায় সেদিকটা আমায় খুঁটিয়ে দেখতে হবে। রূপোর নদীর উৎস ওখানেই চাপা পড়েছে।'

দু'জনে উঠল। মোকা বলল–'চলুন, আমিও যাব।'

ওরা চড়াই পেরিয়ে কঙ্কাল পাহাড়ের মাথরে কাছে পৌঁছল। দেখল কঙ্কালের বাঁ চোখের কাছ থেকে পাথরের ধস নেমেছে। ফ্রান্সিস ভাঙা পাথর ধুলোবালির স্তূপ ভালো করে দেখতে লাগল। হঠাৎ নজরে পড়ল নীচে একটা খুব সরু জলধারা নেমে গেছে। ও বলে উঠল–'দেখ তোমরা–এখানে কোথাও নিশ্চয়ই জমা জলের স্তর আছে। নইলে ঐ সরু ঝর্ণাটা থাকত না।'

'ঐ সরু ঝর্ণাটা অনেকদিন থেকেই দেখছি আমরা। তবে মাঝে মাঝে ওটা শুকিয়ে যায়।' মোকা বলল।

'হতে পারে'।ফ্রান্সিস বলল–'তবু এই জায়গাটাই আমাদের খুঁড়তে হবে। হ্যারি–কাল সকাল থেকেই আমরা খোঁড়ার কাজ শুরু করবো। তুমি জাহাজে বন্ধুদের খবর দিয়ে এসো। মোকা–তুমি ইকাবোদের বলো তারা যেন আমাদের সাহায্য করে।'

মোকা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

ফ্রান্সিস ও জায়গাটায় দাঁড়িয়ে হ্যারি আর মোকাকে কাছে ডাকল। বলল–'ঠিক আমার দৃষ্টি বরাবর নীচের দিকে তাকিয়ে দেখ। কল্পনা কর ঐ নক্সা-ছবির মতো একটা নদী বয়ে গেছে। স্পষ্ট সেই ধারার গতিপথটা দেখতে পাবে। লক্ষ্য করে দেখ সেই গতিপথে শুধু ধুলোবালি পাথর। কোনো গাছ জন্মায়নি।'

'গাছ জন্মায়নি কেন?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

'নিশ্চয়ই ওখানে রূপোর স্তর জমেছিল। রূপোর স্তরে গাছ জন্মাবে কী করে? ওপরের মাটিতে কিছু ঘাস জন্মেছে শুধু।'

ওরা ফিরে এল।

সেইদিনই খবরটা রটে গেল–রূপোর নদীর হদিস পাওয়া গেছে। খুঁড়ে বের করা হবে সেই নদী।

সকাল থেকেই দলে দলে ইকাবো মেয়ে-পুরুষ বাচ্চা ছেলেমেয়েরা জড়ো হলো সেখানে। কিছু পরেই ভাইকিংরা জাহাজ থেকে এল। সঙ্গে আনল গাঁইতি, কুড়ুল, কাছি আর হাতুড়ি।

ফ্রান্সিস, হ্যারি আর মোকা এসে পড়েছে তখন। ফ্রান্সিস জায়গা নির্দিষ্ট করে দিল।

শুরু হলো পাথরের স্তূপ সরানোর কাজ। ইকাবোরাও হাত লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাথরের স্তূপ সরাতে দেখা গেল একটা গুহার মুখ। গুহার নীচের দিকটার পাথরের স্তর ভেজা। ফ্রান্সিস বুঝল কাছে কোথাও জল আছে। সেই জলই চুঁইয়ে চুঁইয়ে এসে জায়গাটা ভিজিয়ে দিয়েছে।

গুহায় ঢুকল ফ্রান্সিস। সঙ্গে বিস্কো আর হ্যারি। বাইরের আলো অল্পই আসছে। বেশ অন্ধকার অন্ধকার ভাব।

'কিন্তু রূপোর নদী কোথায়?'

একটু এগোতেই ফ্রান্সিস দেখল—একটা বড় গহ্বর নেমে গেছে। ফ্রান্সিস পেছনে দাঁড়ানো বিস্কোকে বলল—'কাছি আর একটা জ্বলন্ত মশাল আনো। কাছিটা ঝুলিয়ে দাও।'

বিস্কো নিয়ে এল সেসব। ফ্রান্সিস মশালটা হাতে নিয়ে ঝোলানো কাছি ধরে ধরে নীচে নামতে লাগল। এক মানুষ-সমান নামতেই পায়ে ঠেকল একটা পাথরের চাঁই। ও দেখল এই পাথরের চাঁইই গহ্বরের মুখটা বুজিয়ে দিয়েছে। হয়তো ওপর থেকে ভেঙে পড়েছিল। পাথরের চাঁইটা ভেজাভেজা। তার মানে নীচে জল আছে।

ফ্রান্সিস মুখ তুলে বলল—'বিস্কো, কয়েকজনকে নামতে বলো। এই পাথরের চাঁইটা ভাঙতে হবে।'

মশালটা পোঁতা হলো পাথরের খাঁজে। ফ্রান্সিস একটা চুনা পাথরের টুকরো দিয়ে পাথরের চাঁইটার মাঝবরাবর দাগ দিল। সবাইকে বলল—'এই দাগ বরাবর ঘা মারো, যত জোরে পারো।'

পাঁচ ছ'জন কাছি ধরে নীচে নামল। শুরু হলো পাথরের চাঁইটার ওপর গাঁইতি, কুড়ুল আর বড় বড় হাতুড়ি চালানো। গাঁইতি কুড়ুলের ঘা পড়তে লাগল পাথরের ওপর। আগুনের ফুলকি ছিটকোতে লাগল।

একদল পরিশ্রান্ত হলে অন্য দল নামছে। এভাবেই ঘা মারা চলল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল ঘা মারা।

হঠাৎ পাথরের চাঁইটা ফেটে গেল। যারা হাতুড়ি গাঁইতি চালাচ্ছিল ওটার ওপর দাঁড়িয়ে তারা কিছু বোঝার আগে পাথরের চাঁইয়ের একটা অংশ ভেঙে ঘুরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তোড়ে জল উঠতে লাগল। মুহূর্তে গহ্বরটা জলে ভরে গেল। যারা গাঁইতি, হাতুড়ি চালাচ্ছিল তারা কাছি ধরে একে একে উঠে এল। জল গুহার মুখ দিয়ে ছুটল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচের দিকে। আশ্চর্য। জল সাদাটে। পরিষ্কার। গুহা থেকে জল বেরোতে দেখে বাইরে দাঁড়ানো সবাই উল্লাসে চীৎকার করে উঠল।

মশাল নিভে গেছে। ফ্রান্সিস প্রায় অন্ধকারে জলভরা গহ্বরটায় নামল কাছি ধরে। এক ডুব দিয়ে দেখল পাথরের চাঁইয়ের একটা অংশ ভেঙে উল্টে যাওয়াতে অন্য পাথরের চাঁইটাও আলগা হয়ে গেছে। ও জল থেকে মুখ তুলল। কিছুক্ষণ শ্বাস নিল। তারপর দম বন্ধ করে আবার ডুব দিল। হাতের কাছিটা সেই আলগা চাঁইটার চারিদিকে বাঁধল। এটা করতে তিন-চারবার ওকে ডুব দিতে হলো জলে। মুক্তোর সমুদ্রে যাবার আগে ও অনেকক্ষণ জলে ডুবে থাকার অভ্যাস করেছিল। সেটা কাজে লাগাল। এবার উঠে এল। সবাইকে বলল—'চলো সব গুহার বাইরে। ওখান থেকে আমরা কাছি ধরে টানবো। চাঁইটা তাহলেই কাত হয়ে যাবে, আরো জল উঠবে তখন। সেই জলের তোড়ের সামনে আমরা হয়তো ভেসে যেতে পারি।'

সবাই গুহার বাইরে এল। শুরু হলো কাছি টানা। একটু পরেই পাথরের চাঁইটা কাত হয়ে গেল। বেশ জোরে গুহার মুখ থেকে জলের ধারা বেরিয়ে এল। বাইরে নুড়ি পাথরের ধুলোবালি সব ভাসিয়ে নিয়ে চলল। এবার জলধারা একটা নদীর চেহারা নিল। সবাই গুহার মুখ থেকে সরে দাঁড়াল।

জলে ভেজা কাপড়-চোপড় নিয়ে ফ্রান্সিস একটা পাথরের ওপর বসল। কিন্তু এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে বসে থাকতে পারল না। শুয়ে পড়ে হাঁপাতে লাগল। যারা এতক্ষণ গাঁইতি কুড়ুল চালাচ্ছিল তারাও এখানে ওখানে বসে পড়ল, কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। ইকাবোরা তখনও আনন্দে হৈ হৈ করছে।

ওদিকে রূপোর নদীর ধারা বয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে।-নুড়ি পাথর ধুলোবালির মধ্যে দিয়ে।

একসময় ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডাকল। হ্যারি এল। ফ্রান্সিস বলল—'নদীটার জলের রঙ দেখেছো?'

'হ্যাঁ সাদাই।'

'একটা ন্যাকড়ায় জল নিয়ে ছেঁকে দেখ তো কিছু তলানি পড়ে কিনা।'

কিছুক্ষণ পরে হ্যারি ফিরে এল। হেসে বলল—'সাবাস ফ্রান্সিস। তোমার অনুমানই ঠিক। ন্যাকড়ায় গুঁড়ো গুঁড়ো রূপোর আস্তরণ পড়েছে। অল্প।'

'হতেই হবে।' ফ্রান্সিস বলল—'দীর্ঘদিন ধরে নদীর নীচে এই স্তর পুরু হয়ে জমত। তাই থেকে ইকাবোরা রূপো তুলতো।'

সন্ধ্যে হয়ে এল। ভাইকিংরা জাহাজে ফিরে গেল। ইকাবোরা নিজেদের বসতিতে। ফ্রান্সিস ও হ্যারি নিজেদের আস্তানায়।

পরদিন। একটু বেলা হয়েছে তখন। ফ্রান্সিসের সবে ঘুম ভেঙেছে। হ্যারি উঠে পড়েছে। মুখ ধুচ্ছে।

হঠাৎ মোকা ছুটতে ছুটতে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'শিগগির দেখবেন আসুন।'

'কী হয়েছে' ফ্রান্সিস জিজ্ঞেস করল।

'রূপোর স্তর পাওয়া গেছে।'

'সত্যি?' হ্যারি চমকে উঠল।

ফ্রান্সিস হাসল—'ঐ নদীই আসল রূপোর নদী। কুন্‌হা নয়।'

ওরা আর দেরী করল না। দ্রুত পায়ে চলল রূপোর নদীর দিকে।

সত্যিই রূপোর স্তর। নদীর জল ওপরের ছোট পাথর ধুলো-বালি মাটি সরিয়ে দিয়েছে। বড় বড় কিছু পাথর পড়ে আছে। সেসবের আড়ালে নীচে রূপোর স্তর দেখা যাচ্ছে। গুহার সামনেই সেই স্তরটা স্পষ্ট দেখা গেল। প্রায় এক হাত পুরু নিরেট রূপোর আস্তরণ। চওড়ায় প্রায় হাত দশেক। নীচের দিকেও কিছুদূর পর্যন্ত সেই আস্তরণ দেখা গেল। তারপর থেকে পাথর জমা। ওগুলোর নিচটা এখনও পরিষ্কার হয়নি।

'এত রূপো? এ যে কল্পনাতীত।' মোকা চীৎকার করে বলে উঠল।

'মোকা—নইলে মন্দিরের অতগুলো থাম নিরেট রূপোয় কী করে তৈরি হলো?' ফ্রান্সিস বলল।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি নিজেদের আস্তানায় ফিরে চলল। ইকাবোরা তখনও রূপোর নদীর দু'ধারে দাঁড়িয়ে চীৎকার হৈ-হল্লা করছে।

জাহাজ থেকে ভাইকিংরাও আনন্দে হৈ হৈ করে এল। রূপোর নিরেট আস্তরণ দেখে সবাই হতবাক।

'শিগগির দেখবেন আসুন।'

দুপুরে খেতে বসে ফ্রান্সিস বলল–'হ্যারি–জাহাজে খবর পাঠাও। বিদায় কঙ্কাল দ্বীপ। এবার দেশে ফেরা।'

'কিছু রূপো নিয়ে যাবে না?' হ্যারি জিজ্ঞেস করল।

'ন্নাঃ।' ফ্রান্সিস বলল–'রাজাকে অনেক কিছু এনে দিয়েছি। এবার আর নাই-বা কিছু নিয়ে গেলাম।'

বিকেলে মোকা এল। জিজ্ঞেস করল–'আপনারা কি আজই যাচ্ছেন?'

'না, কালকে জাহাজ ছাড়বো।' ফ্রান্সিস বলল।

'একটা অনুরোধ ছিল আমার।'

'বলো।'

'আপনাদের ঋণ কোনোভাবেই শোধ করতে পারবো না, তাই বলছিলাম– মন্দিরের দু'টো রূপোর থাম যদি আপনারা গ্রহণ করেন।'

'কী বলছো মোকা? তোমাদের দেবতার পবিত্র থাম।'

'আমি সর্দারদের সঙ্গে কথা বলেছি। সবাই সম্মতি দিয়েছে। পুরোহিতও বলেছে–এতে কোনো পাপ হবে না। পরে দুটো থাম তৈরি করে দিলেই হবে।'

ফ্রান্সিস হ্যারির দিকে তাকাল। বুঝে উঠতে পারল না কী বলবে। হ্যারি বলল–'নাও ফ্রান্সিস। মোকা যখন এত করে বলছে। তাছাড়া এই থাম দুটো হবে ইকাবোদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের নিদর্শন।

ফ্রান্সিস বলল–'বেশ।'

গিয়ানি মন্দিরের নিরেট রূপোর থামগুলো খুব গভীরে পোঁতা নয়। ইকাবো পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে কয়েকজন ইকাবো মিলে থামের তলা খুঁড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দুটো থাম আলগা হয়ে গেল। আরো কয়েকজন মিলে থাম দুটো টানাটানি করতেই দুটো থাম উঠে এল। জল দিয়ে থামের তলায় লেগে থাকা মাটি ধোয়া হলো। নারকোল ছোবড়া দিয়ে ঘষে ঘষে উজ্জ্বল করা হলো থাম দুটো। লতাপাতা পশুপাখি খোদাই করা থাম দুটো সুন্দর লাগল দেখতে।

ফ্রান্সিস আর হ্যারি দাঁড়িয়ে এসব দেখছিল। মোকাকে পুরোহিত কী বলল। মোকা ফ্রান্সিসকে বলল–'পুরোহিত বলছে–এগুলো পবিত্র থাম। এ দুটোতে যেন কারো পা না লাগে। এগুলো কোনো কারণেই গলাবেন না বা বিক্রী করবেন না।'

ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল–'নিশ্চিন্ত থাক। এই থামের পবিত্রতা আমরা রক্ষা করবো।'

বেশ ভারী থাম। দু'দল ইকাবো কাঁধে করে থাম দুটো নিয়ে চলল সমুদ্রতীরের দিকে। ফ্রান্সিস আর হ্যারিও চলল সেই সঙ্গে। সবার সামনে পুরোহিত বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে পড়তে চলল।

সমুদ্রতীরে থাম দুটো নামানো হলো। একটু সমস্যা দেখা

ক্রাইম সিরিজ

সম্পূর্ণ নতুন ধরনের বই। শার্লক হোমসের মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, জেমস বন্ডের মতো লড়িয়েদের নিয়ে একটির পর একটি মোট ষোলটি বই বেরিয়েছে। যে কোনো গোয়েন্দা উপন্যাসও হার মানবে এর কাছে। উত্তেজনায় টানটান, রোমাঞ্চে ভরপুর সব কান্ডকারখানা। লিখেছেন–

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

বার বার পড়ার এবং প্রিয়জনকে উপহার দেবার মতো ষোলটি বই দাম মাত্র সাত টাকা করে।

বুলেটের শিস্
উজ্জ্বল নীল মৃত্যু
উড়ন্ত বাজ
জ্বলন্ত আগুন
অদৃশ্য কালো হাত
মৃত্যুদূতের শেষ প্রহর
শকুনেরা ওৎ পেতে
রুপোলী বিছের কামড়
প্রবাল দ্বীপের বিভীষিকা

নরহত্যা
গুপ্তহত্যা
রাত্রির কালো দূত
নিয়ত বিপন্ন মৃত্যু
হাঙরেরা রক্তমাখা ঠোঁটে
কালো কালো শিকারী বেড়াল
ও একুশ নম্বর বাংলো

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিঃ
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলি-৯

দিল। কী করে থাম দুটো জাহাজে তোলা যায়।

ফ্রান্সিস হ্যারিকে পাঠাল জাহাজের গায়ে বাঁধা সবগুলো নৌকো নিয়ে আসতে। হ্যারি একটা নৌকো চালিয়ে জাহাজে গেল। কয়েকজন ভাইকিং নৌকোগুলো নিয়ে কিছুক্ষণ পরেই এল।

ফ্রান্সিস নৌকোগুলো পরপর সাজাল। মোটা কাছি দিয়ে নৌকোগুলো পরস্পর বাঁধলো। তারপর ইকাবো আর ভাইকিংরা মিলে থাম দুটো সেই নৌকোয় বাঁধা সারির ওপর আস্তে আস্তে রাখল। খুব ভারী থাম দুটোর ভারে নৌকোগুলোর অনেকটা জলে ডুবে গেল। থাম দুটো এবার নৌকোগুলোর সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো। থাম দুটোর আর গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রইল না।

ভাইকিংরা বৈঠা হাতে নৌকোয় উঠল। এবার ফ্রান্সিসের বিদায় নেবার পালা। মোকা ফ্রান্সিসকে বুকে জড়িয়ে ধরল। কিছুক্ষণ ঐভাবেই রইল। আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে ফ্রান্সিস এবার জড়ো হওয়া ইকাবো নারীপুরুষ-শিশুদের দিকে তাকাল। সবাই নির্বাক তাকিয়ে আছে ফ্রান্সিসের দিকে। দু'একজন চোখ মুছছিল। ফ্রান্সিসেরও মনটা খারাপ হয়ে গেল। ম্লান হেসে ও হাত নেড়ে বলল–'বিদায় ভাইবোনেরা।' ইকাবোরা কোনো কথা বলল না। একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

ফ্রান্সিস নৌকোয় গিয়ে উঠল। হাতে বৈঠা তুলে নিল। দড়িবাঁধা নৌকোর বহর চলল জাহাজের দিকে। নৌকোর ওপর থাম দুটো।

জাহাজের কাছে পৌছে ও পেছন ফিরে তাকাল। দেখল ইকাবোরা তেমনি নির্বাক দাঁড়িয়ে আছে।

জাহাজে উঠল সবাই। দড়ি বেঁধে থাম দুটো তোলা হলো জাহাজে। নৌকোগুলো বাঁধা হলো জাহাজের সঙ্গে।

ডেকে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস চীৎকার করে বলল–'নোঙর তোল। পাল তুলে দাও। দাঁড়িরা দাঁড়ঘরে যাও। বাতাসের তেমন জোর নেই।'

সব ভাইকিংরা চীৎকার করে উঠল একসঙ্গে–ও–হো–হো।' তারপর সবাই যে যার কাজে লাগল।

ঘড় ঘড় শব্দে নোঙর উঠল। পাল খাটানো হলো। জলে দাঁড় পড়তে লাগল– ছপ্–ছপ্।

একটা পাক খেয়ে জাহাজ চলল। দূরে সরে যেতে লাগল কঙ্কাল দ্বীপ। কিছু পরেই আর দেখা গেল না কঙ্কাল পাহাড়। এখন চারদিকে শুধু অথৈ জল।

জাহাজের ডেক-এ দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিস তখনও কঙ্কাল দ্বীপের দিকে তাকিয়ে আছে। তখনও ওর মন বিষণ্ণ।

শেষ

ছবিঃ নারায়ণ দেবনাথ

বরেন্দ্রকুমার বৈদ্য স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প।

একতাই বল

কবিতা চৌধুরী

পিপীলিকাদের রাজ্যে দারুণ উত্তেজনা। সারা রাজ্য জুড়ে এক বিষাক্ত হৈচৈ। যেখানে সেখানে পিপীলিকাদের সভাসমিতি লক্ষ্য করা যায়। পিপীলিকারা সব ভয়ে জড়োসড়ো। প্রত্যেকের চোখেমুখেই আতংক। ব্যাপারটা কি? বেশ কিছুদিন আগে এক বিরাট অজগর সাপ পিপীলিকাদের রাজ্যে ঢুকে পড়ে। সব পিপীলিকা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে। তারা ভাবছে এত বড় একটা অজগর সাপ কি করে তাদের রাজ্যে প্রবেশ করল? রাজ্যের প্রবেশপথ কি ভাবে খুঁজে পেল? অজগরের ভয়ে সবাই তটস্থ। সেই অজগরের দেহের চাপেই অসংখ্য পিপীলিকা ইতি-মধ্যেই প্রাণ হারিয়েছে। এখন আর পিপীলিকাদের মধ্যে কোনো দলাদলি নেই। ছোট, বড়, কালো, লাল, ডেয়ো, কাঠ পিপীলিকা, সবাই একসংগে মিলিত হয়েছে। প্রত্যেকেই চিন্তা করে চলেছে কি করে সেই অজগরকে মারা যায়। এর মধ্যে একদিন লাল পিপীলিকার দল প্রস্তাব দিল, রাজার কাছে গিয়ে তাদের এই দুর্দশার কথা জানানোর।

সবাই তাদের প্রস্তাব মতো সেদিন দুপুর বেলা রাজবাড়িতে গেল। গিয়েই প্রচণ্ড হৈচৈ বাধিয়ে দিল। রাজা তখন মধ্যাহ্নভোজ সমাপন করে দিবানিদ্রা দেবার পরিকল্পনায় ছিলেন। হাজার হাজার প্রজা পিপীলিকার চেঁচামেচিতে রাজ-পরিকল্পনা মাঠে মারা গেল। রাজা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে তাদের এত চেঁচামেচির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। পিপীলিকার দল তাদের দুর্দশার কথা জানালো। রাজাদের কাছে প্রজারা সব সময় সমস্ত সমস্যার মীমাংসা আশা করে থাকে। কিন্তু সব কথা শুনে রাজা কোনো প্রতিকারের আশ্বাস তো দিলেনই না বরং তাদেরই ধমক দিলেন। রাজ্যে নতুন অতিথির আগমনে তারা অতিথির যথাযোগ্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা না করে, অতিথিকেই শত্রু ভেবে তাঁর বিরুদ্ধে নালিশ করতে এসেছে।

পিপীলিকারা ভেবেছিল, তাদের রাজা তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার করার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু রাজার কাছে ঐ অপ্রিয় কথা শুনে তারা হতাশায় ভেংগে পড়ল। কিন্তু তারা একে অপরকে ইশারা করে সমস্ত রাজবাড়ি ঘেরাও করে রাজাকে অদৃশ্য শৃংখলে আটকে রাখল। এতেও কোনো ফল হলো না। তারা তখন নিরাশ হয়ে ফিরেই এল।

বেশ কিছুদিন তারা দুঃখের মধ্য দিয়ে কাটাল। একদিন তারা এক সভা ডাকল। সমস্ত পিপীলিকার দল এই সভায় যোগদান করল। ছোট পিপীলিকার মধ্য থেকে একজন হলো সভাপতি। তারা আলোচনা করল কি করে সেই অজগরের ভবলীলা সাংগ করা যায়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করল। কিন্তু কারও কথাই সভাপতির মনঃপূত হলো না। অবশেষে কালো পিপীলিকার মধ্য থেকে একজন তার বক্তব্য পেশ করল। তারা সবাই মিলে যদি একজোট হয়ে সেই

যমদূতকে আক্রমণ করে তাহলে তাদের বিষের জ্বালায় অজগরের মৃত্যু অনিবার্য!

সভাপতির কণ্ঠস্বর শোনা গেল, প্রস্তাবটা মন্দ নয় কিন্তু বিষওয়ালা পিপীলিকা কজন আছে, সভাপতি জানতে চাইল। সংগে সংগে হাজার হাজার লাল পিপীলিকা, লক্ষ লক্ষ ডেয়োঁ পিপীলিকা, কোটি কোটি কাঠ পিপীলিকা একসংগে জড়ো হয়ে বিষ পিপীলিকা হিসেবে তাদের পরিচয় দিল।

সভাপতির নির্দেশ হলো, তারা সব একসংগে গিয়ে লেজের দিক থেকে সেই অজগরকে আক্রমণ করবে।

সবাই সেই পরামর্শমতো একসংগে দল বেধে চলল সর্প ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। অজগর সাপটা তখন একটা বেশ বড় আমগাছের গুঁড়িতে নিজের শরীরকে পেঁচিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। সেই সময় বিষযুক্ত পিপীলিকারা সাপটাকে ছেঁকে ধরল। সাপটা প্রথমে বুঝতে পারেনি যে তাকে শত্রুপক্ষ আক্রমণ করেছে। কিন্তু পরে ব্যাপারটা ভালো ভাবে অনুভব করে গাঝাড়া দিয়ে উঠে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। রাগে উত্তেজনায় ফোঁস ফোঁস শব্দ উঠতে লাগল। কিন্তু সেই বিষাক্ত পিপীলিকার দল তাকে কিছুতেই রেহাই দিল না। তারা সেই বিশাল অজগরের দেহটাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। বিষহীন পিপীলিকার দলও তাদের সংগে যোগ দিল। তারাও সুড়সুড়ি দিয়ে অজগরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল।

বনের মানুষখেকো বাঘ যেমন জলে পড়ে গেলে জলের কুমীরের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়, তেমনি অজগরটাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিপীলিকার কাছে হার মানতে বাধ্য হলো। পিপীলিকার দল আড়াই ঘণ্টা একটানা সাপের সংগে লড়াই করে তাকে শেষ করে দিল।

পিপীলিকাদের রাজ্যে আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। তারা প্রত্যেকেই অনুভব করল একতার বল কেমন কার্যকরী হয়। সাহস করে এক সংগে তারা রুখে দাঁড়িয়েছিল। তাই আর তাদের কোনো ভয় নেই।

বরেন্দ্রকুমার বৈদ্য স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প

শোধ

সুব্রত মজুমদার

হতচ্ছাড়া কাকটা সকাল থেকেই জ্বালাতে শুরু করবে। প্রত্যেক দিন। রান্নাঘরের চালে বসবে, আর তারস্বরে চেঁচিয়ে যাবে, কা কা কা। কানের মাথা খেয়ে ফেলে। মাঝে মাঝে ঘাড়টা নিচু করে দেখে রান্নাঘরে কেউ আছে কিনা, বা মাছ-টাছ কিছু কাটা হচ্ছে কিনা। তারপরই, আবার শুরু করবে সেই কর্কশ চিল্লানি। মা বিরক্ত হয়ে যান,–আপদটা আর জায়গা পায় না। কানের সামনে চেঁচিয়ে মাথাটা ধরিয়ে দিল।

সন্তুও রেগে যায়। একটা লাঠি নিয়ে তাড়া দিলে কাকটা চাল ছেড়ে সামনের বেলগাছের ডালে গিয়ে বসে। একটু লক্ষ্য করে সন্তুকে, আবার চেঁচাতে থাকে, কা কা কা। বিরক্ত সন্তু ছোট ছোট ইটের টুকরো যদি ছোঁড়ে, চালাক কাকটাও এ-ডাল থেকে ও-ডাল করবে তবু যাবে না বাড়ি ছেড়ে। একটা গুলতি অবশ্য আছে সন্তুর, কিন্তু ওটা হাতে দেখলেই কাকটা উড়ে গিয়ে পাশের বাড়ির ছাদে বসে থাকবে চুপচাপ! যতক্ষণ না সন্তু সরে যাচ্ছে। মা বলেন,–তোকে আর কাক মারতে রোদ্দুরে পুড়তে হবে না, ঘরে যা। স্কুলে যেতে হবে তো। কাকের পিছনে ঘুরলেই চলবে?

মার উপরে মাঝে মাঝে সন্তুর রাগ হয়ে যায়। মা-টা যেন কী! কাকটা বিরক্ত করলে তখন বক্ বক্ করবে, আর এখন এমন ভাবে কথা বলছে যেন আমিই কাকটার পিছনে স্কুল ফাঁকি দেবার জন্য ঘুরছি, যাক গে...।

কদিন পর হঠাৎ সন্তুর নজরে পড়ে বেলগাছটার ডালে বাসা বানাতে শুরু করেছে কাকটা। ঝাঁটাকাঠি, ছাতার শিক, তার, যা পাচ্ছে এনে জড় করছে বেলগাছের ডালে। পঞ্চাশ বার নিচে পড়ছে আবার তুলে গোঁজাগুঁজি করছে, নোংরা করে ফেললো উঠোনটা। ভেঙেই দিতে হবে বাসাটা, ভাবে ও।

মাসতুতো বোন বিংকির বিয়ের নেমন্তন্ন রাখতে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে যেতে হলো শিলিগুড়ি। বিয়ের হৈ-হুল্লোড় সব মিটে যাবার পরে সন্তুরা বাড়ি ফিরল।

বাড়ি এসে অবাক সন্তু। কাকটা তার বাসাটা বানিয়েই ফেলেছে। পরদিন স্কুল থেকে ফিরেই একটা লাঠি নিয়ে সন্তু বেলগাছের গোড়ায় হাজির হলো। অনেক চেষ্টাতেও নাগাল পেলো না বাসাটার। মাথার মধ্যে আরেক বুদ্ধি খেলে। একটু একটু করে গাছটা বেয়ে উঠতে থাকে। ইচ্ছাটা অল্প উঠে তারপর লাঠি দিয়ে ভেঙে দেবে বাসাটা।

একটু দূর থেকে কাকটা সন্তুর হাবভাব দেখেই বুঝতে পারে ওর ইচ্ছাটা। প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচাতে থাকে, কাঃ কাঃ, ডাকতে থাকে দলের সঙ্গীদের, বিপদে বাঁচাবার জন্য। সন্তু ভাবে, চেঁচা কত চেঁচাবি–তোর বাসা ভাঙবই।

ডাক শুনে সাড়া দেয় অন্য কাকসঙ্গীরা। একটা, দুটো, তিনটে, জমতে থাকে একের পর এক কোনোটা টিনের চালে, কোনোটা কাপড় মেলা তারে, কোনোটা বেলগাছের ডালে। বসে আর চেঁচায়, ডাকে আরো আরো সঙ্গীকে। সন্তু মজা পেয়ে যায়, একটু ক'রে ওঠে, হাতের লাঠিটা নাড়া দেয় কখনো বাসাটার দিকে কখনো কাকের দিকে। ওদের চিৎকার দ্বিগুণ বেড়ে যায়, এ-ডাল থেকে সে-ডালে উড়ে যায়, এ-চাল থেকে সে-চাল। হঠাৎ কেমন যেন হিংস্র হয়ে ওঠে কাকগুলো, উড়ে চলে আসে সন্তুর দিকে, চেঁচাতে চেঁচাতেই ঠোকর মারে ওকে। মাথায়, পিঠে, পায়ে যেখানে সুযোগ পায়। বেশ ব্যথা পাচ্ছে সন্তু। হাতের লাঠিটা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কাক তাড়াতে। যায়ও না ওগুলো! একসঙ্গে মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সন্তুর উপর। বাঁচাতেই হবে সঙ্গীর বাসাটা।

তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে পড়তে চায় সন্তু। তাড়াহুড়া করতে গিয়ে পড়েই যায় ও। ইতিমধ্যে কাকেদের চিৎকার চেঁচামেচিতে মা-ও বেরিয়ে আসেন। সন্তুর অবস্থা দেখে ছুটে যান। মাকেও ছাড়ে না কাকগুলো। অনেক কষ্টে সন্তুকে নিয়ে যখন ঘরে ঢুকলেন তিনি, সন্তুর অবস্থা তখন বেশ খারাপ। পড়ে যাবার জন্য বেশ ব্যথা পেয়েছে, তাছাড়া কপাল মাথা পিঠ কাকের ঠোকরে ঠোকরে কোথাও ফুলেছে, কোথাও ছড়েছে। দুটো দিন সন্তু বেরুতে পারেনি কোথাও। দুদিন পর একটু সুস্থ হ'য়ে স্কুলে গেল সন্তু। মনের রাগ এবার আরো বেশি। সামান্য কাকের কাছে পর্যুদস্ত হওয়া, মার বকুনি, ব্যথা পাওয়া সব মিলিয়ে মেজাজটা গরম করেই রেখেছে ওর। সেদিন স্কুল থেকে ফেরার পর বন্ধুদের বলে,–চল্ আজ আমরা একটা নতুন খেলা খেলব আমাদের বাড়ি।

ও বুঝেছে ওর একার পক্ষে কাকের ওই বাসা ভাঙা-টাঙা সম্ভব হবে না। ছোট্ট একরত্তি সামান্য কাকগুলো যে ভাবে একসঙ্গে অনেক হয়ে ওকে নাকাল করেছিল এবার ও সেই রাস্তাতেই শেষ করে দেবে কাকটার বাসাটাকে।

বন্ধুরা আসে, আর ওর ইচ্ছাটা শুনে সবাই তো এক পায়ে খাড়া। তারপর সে বাসাটা ভেঙে ফেলতে আর দেরি হয় না ওদের।

অবস্থার প্রয়োজনে হাজির হয়েছিল অনেক কাক চেঁচিয়েছিলো, ঝাঁপিয়েও পড়েছিলো সন্তুদের বাধা দিতে কিন্তু এবার ওরা হেরে গেল।

ছবিঃ রাহুল মজুমদার

---

২৪ পরগণা জেলার গোসবার মন্মথনগরের বিপ্রদাসপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হাজারীলাল মণ্ডল তাঁর একমাত্র মেয়ে, প্রয়াতা কমলা মণ্ডলের নামে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর প্রস্তাব মত আমরা কমলা মণ্ডল স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে মৌলিক লেখা চাইছি।

বিষয়বস্তু

সবে মিলি করি কাজ
হারি জিতি নাহি লাজ।

লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ ৩০ চৈত্র ১৩৯৩।
পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখা দুটি শুকতারার আষাঢ় সংখ্যায় ছাপা হবে।

প্রথম পুরস্কারঃ ২০ টাকা **দ্বিতীয় পুরস্কারঃ ১৫ টাকা**

হাঁদা-ভোঁদার
চাঙ্গা দাওয়াই
ক্লান্তি অনুভব করছি! এদিকে মাস্টারমশাই আজ সকালে পড়তে যেতে বলেছেন।
সুপ্রভাত, ভোঁদা!
উফ্!
ছিঃ ছিঃ! ভালো করে চোখই খুলতে পারছিস না। এই সকালে তোর উচিত ফুর্তির সঙ্গে এগিয়ে চলা।
নে,আমি তোকে স্টার্ট দিয়ে দিচ্ছি!
গেছি রে!
এটা তোকে তোর ক্লান্তি দূর করে চাঙ্গা করতে সাহায্য করবে, হেঃ হেঃ!
ওরফ! আমার পা গেলো!
এবার যে প্রক্রিয়াটা প্রয়োগ করছি তাতে তুই প্রায় পুরো চাঙ্গা হয়ে যাবি!
ইরক্!
এবার উঠে দাঁড়া, দেখবি তোর ক্লান্তি উবে গেছে।

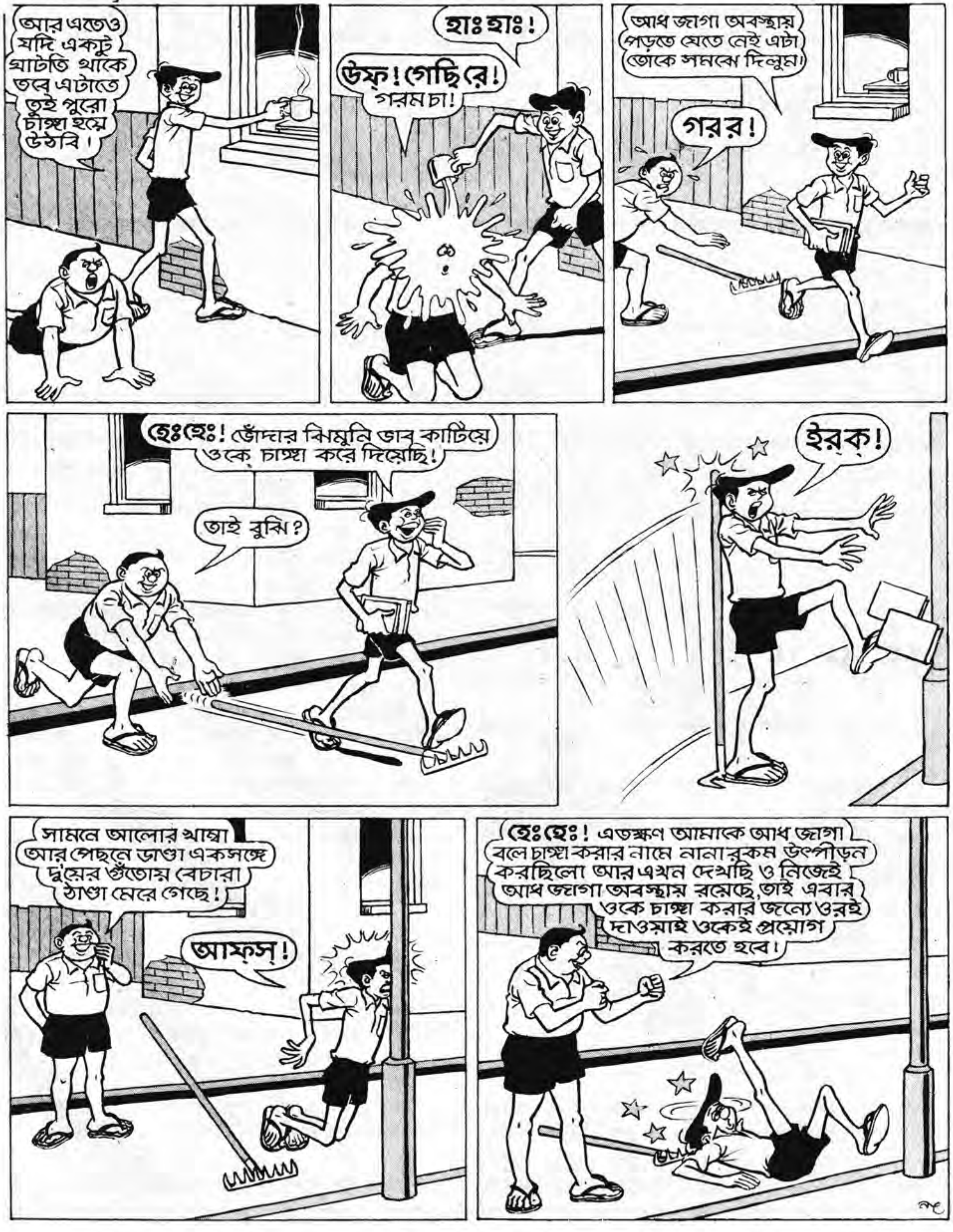
আর এতেও যদি একটু ঘাটতি থাকে তবে এটাতে তুই পুরো চাঙ্গা হয়ে উঠবি।
হাঃ হাঃ!
উফ্! গেছি রে! গরম চা!
আধ জাগা অবস্থায় পড়তে যেতে নেই এটা তোকে সমঝে দিলুম।
গরর!
হেঃ হেঃ! ভোঁদার ঝিমুনি ভাব কাটিয়ে ওকে চাঙ্গা করে দিয়েছি!
তাই বুঝি?
ইরক্!
সামনে আলোর থাম্বা আর পেছনে ডাণ্ডা একসঙ্গে দু'য়ের গুঁতোয় বেচারা ঠাণ্ডা মেরে গেছে!
আফ্‌স্!
হেঃ হেঃ! এতক্ষণ আমাকে আধ জাগা বলে চাঙ্গা করার নামে নানারকম উৎপীড়ন করছিলো আর এখন দেখছি ও নিজেই আধ জাগা অবস্থায় রয়েছে, তাই এবার ওকে চাঙ্গা করার জন্যে ওরই দাওয়াই ওকেই প্রয়োগ করতে হবে।

নতুন ধাঁধা

১. মাথা কেটে নিচু হয়
সবে মিলে ভারী নয়
আদি-অন্ত মিলে তাই
যাত্রায় চলি ভাই।

সৌমেন ঘোষ/আরামবাগ, হুগলী

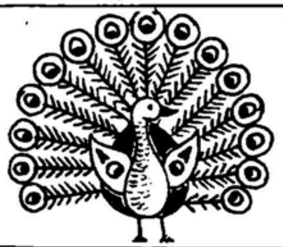

৩. চরণ ছাড়া বশে আসি
বা-কে বাদে গড়তে বসি
সবেতেই বাধা পাবে
উত্তরটা বল ভেবে।

প্রশান্ত কুমার ঘোষ/লেকপাড়া, হুগলী

২. দিও না, তার আগে যদি পাও
সবটা এবার, শোধ তুমি করে দাও।

বিভাংশু দত্ত/পল্লীশ্রী, আরামবাগ, হুগলী

পৌষ সংখ্যার ধাঁধার উত্তর
১. আলতা ২. কুহক ৩. কিন্নর ৪. সেনা

৪. পলক ফেলে দেখি ভাই
প্রথম রাশির মাথা নাই।

স্মৃতিকণা ও অজয়কুমার রায়
পোঃ গ্রাম/বহড়ু ২৪-পরগণা

নতুন শব্দমালা

১	২		■	৩	৪	৫	৬
৭		■	■	■	৮		
৯		১০	■	১১		■	
	■	১২	১৩		■	■	■
■	■	■	১৪		১৫	■	১৬
১৭	■	১৮		■	১৯	২০	
২১	২২		■	■	■	২৩	
২৪				■	২৫		

সূত্র

পাশাপাশি

১. বিমল ঘোষ ছদ্মবেশে/বসেন এসে শিশুর পাশে ৩. খাবার দাবার নয় সে জানি/গিরিপথ এ আফগানি ৭. মাল পিঠে তাড়াতাড়ি/ধেয়ে চলে হাওয়াগাড়ি ৮. মেঘের গুরুগুরু/এবার হলো শুরু ৯. অর্থ বোঝায় যে/কথক ঠাকুর সে ১১. ভন্ড লোকে ধরে'/কম্মো হাসিল করে ১২. বেগম পাশে ইনি/নজরুলগীতি রাণী ১৪. তাগদ জোগায় যে/লাঙল টানেও সে ১৮. রাশির মাঝে পাবে ঠিক/ঘাট পাশেতে চারিদিক ১৯. আকাশেতে ঘুড়ি ওড়ে/তখন এটি হাতে ঘোরে ২১. সব সেরা এই জেলকে দেখি/চার্লস শোভরাজ দিলেন ফাঁকি ২৩. এই মাছটির লিভার থেকে/তেল বানিয়ে গায়ে মাখে ২৪. ট্যাক্সি চড়ে' বর/পাশেই মিনিবর ২৫. ভয়ের পরেই বসে'/ভয়কে বোঝায় কষে

ওপর নিচ

১. শরিয়তের কঠিন বিধান/এঁদের কাছে পরম নিদান ২. মায়া-মৃগের ছলায়/সীতাকে যে ভোলায় ৪. রঙের সাহেব-বিবি তাসে/পায়ে-মাথায় মাছ কোথা সে ৫. অতি বর্ষায় আসে/ঘরবাড়ি-প্রাণ নাশে ৬. ডাকাতদেরই বাহন ছিল/আজ ছেলেদের খেলনা হলো ১০. দুধের সাথে মিশিয়ে নিয়ে/সিড়িক সিড়িক নাও না পিয়ে ১১. মেকি জিনিস মিশিয়ে দিয়ে/দামটি খাঁটি নেয় যে নিয়ে ১৩. মানব ইনি যন্ত্রকায়া/মস্তকহীন যোগায় ছায়া ১৫. খন্ড এটি পিন্ডকারা/ক্রিয়ার বেশে দমন করা ১৬. দেশ দেখতে যখন যাও/এদের তখন সঙ্গে নাও ১৭. দেশ জোড়া নাম যাঁর/নামজাদা সকারার ১৮. দেশটা জুড়ে তেলের খনি/আ-বাদেতে শুধু ধ্বনি ২০. চ বলতে যেখানে/জিভটা ঠেকে এখানে ২২. শব্দমালা সঙ্গে মোর/বিদায় আগে করি জোড়

তৈরি করেছেন শান্তিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/ডাক/সগড়াই

শ্রাবণ সংখ্যার ধাঁধার বাকি উত্তর দাতাদের নাম

॥ ২৪-পরগনা ॥

ঋতুপর্ণা ও অনীশ সেনগুপ্ত/দেবীতলা রোড, ইছাপুর, নবাবগঞ্জ; কল্যাণী, আবীর, টুটুন, বিশ্বজিৎ ও সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়/মহেশতলা; চণ্ডীদাস দত্ত/উম্তি, দত্তপাড়া; খুকু, ভোলা, পুটু ও ভাই/সাগরপুর, বাগদা; শুভ্রা ও সুব্রত দত্ত/সরোজ পার্ক, বারাসত; শংকর, অরুণ, তরুণ, গোপাল, চন্দন, বাপী, শিবু, চম্পা,পুতুল ও রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী/সারদা পল্লী; কৃটি, বাবু, তরুণ, তপন, চন্দন ও আশিস/গাঁতি স্কুল কোয়ার্টার, গাঁতি; দীপঙ্কর, শান্তনু ও রাকা/দক্ষিণ চাতরা; সুজয় ব্যানার্জী/নবপল্লী, গড়িয়া; লুসি ও অমূল্যচন্দ্র চ্যাটার্জী/হরিতলা, বারাসাত; সৌমিক, সুমিত্রা ও নারায়ণ মজুমদার/ওল্ড ক্যালকাটা রোড, তালপুকুর; অনির্বাণ, প্রবাহন, কাঞ্চন/বাসুদেবপুর রোড, শ্যামনগর; অনির্বাণ, কণাদ ও অংশুমান ভট্টাচার্য/বৈকুণ্ঠপুর, সোনারপুর; শান্তা, মণ্টু, মিণ্টু, বাপী/আচার্য প্রফুল্লনগর, দক্ষিণ চাতরা; বাবান, বুবা, ফুলি, অলোক, অমলা, বাপী, টুনু/পানিহাটি, কাঁসারী পাড়া; দীপঙ্কর, শুভঙ্কর ও সুধীন রায়/সুভাষনগর, সোদপুর; বরুণ, ভাস্কর, মৈনাক ও মন্দিরা দাশশর্মা/'শরনং', মণিরামপুর, ব্যারাকপুর; সুপ্রিয়, গৌতম ও সৌমেন/হরিদাস শাঁতরা ঘাট রোড/সুখচর; রীতা, দীপা, মিতা, মলয় ও টুকু/কল্যাণগড়; বাপ্টু, মামন ও প্রশান্ত ভূঁইয়া/সুখচর; টোকন, রুণা, টুবাই/অমরমাঠ হাউসিং এস্টেট, সারেঙ্গাবাদ; ভারতী, কেষ্ট ও জ্যোতিশংকর/নেতাজীনগর, দত্তপুকুর; শুভ্রা ও সরোজ দত্ত/সরোজ পার্ক, বারাসাত, সৌমেন ও শুভেন্দু নন্দী/বারাসাত, রাসবিহারী স্কুল রোড; সৌভিক, ইরা, লিপি, সৌরেন, হ্যাপি, শুভ্রা, সতোন ও অন্যান্যরা/রাসমাঠ, বারুইপুর; মিনতি, শিশির, পীযূষ ও ভাস্বতী তপস্বী/বোড়াল; বাবুয়া, বুড়ি, ভাই, কচি, বাবলু ও গৌতম/উম্তি; টুনটুনি, মিকেন ও মোমপু/গরিফা, নৈহাটি; জগন্নাথ, সন্ধ্যা, সুমন্ত্র ও অবন্তিকা বসু/হালিশহর, পূর্বাচল; উষা, কালু, স্বরাজ, বিমল, মৃণাল ও সোমনাথ পাল/আব্দুল জব্বর রোড, কাঁচরাপাড়া; সুতপা ও ডায়মণ্ডহারবার কলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা/ডায়মণ্ডহারবার; সিদ্ধার্থ ও মৌসুমী চক্রবর্তী/হরলালনগর, কাঁচরাপাড়া; সোমা, শ্রাবণী, মধুমিতা ও মধুমিতা দে/বাখরাহাট; সৌমিত্রশঙ্কর ও সুগতশঙ্কর উকিল/তালবাগান, ব্যারাকপুর; দীপান্বিতা, মহুয়া ও পার্থ সমাদ্দার/১১ নং রেল গেট, হৃদয়পুর; আলভা, অরিন্দম ও দীপঙ্কর মিত্র/নহাটা, নহাটা সারদা সুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়; সোনা, বাবী, বাবাই, ঝিলাম, তিতির, নূপুর ও তাপস সেনগুপ্ত/বাঁশদ্রোণী প্লেস; বনানী, কাকলি ও প্রদীপ্ত দেবনাথ/রহড়া;

॥ বর্ধমান ॥

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব-এর সদস্যবৃন্দ, গুসকরা; কৌশিক, ঋত্বিক, সান্ত্বনা ও সুনন্দা/মদনপুর; গৌরাঙ্গ, নিতাই, বাপ্পা ও টুম্পা চট্টোপাধ্যায়/গোপালমাঠ; দেবারতি ও দেবর্ষি চট্টোপাধ্যায়/সাগরভাঙা হাউসিং কলোনী, দুর্গাপুর-১১; শিপ্রা, শুক্লা ও টুবলু/পি.এ্যাণ্ড.টি কলোনী, দুর্গাপুর-৫; পিংকি, বুবাই, বুয়া, চুয়া, চুমকি ও গুঞ্জন/ডি.ভি.সি কলোনী, অণ্ডাল; অরিন্দম ও মানসী/তেঁতুলিয়া; কাঞ্চন, নয়ন ও অয়ন রায়/নামপাড়া, আসানসোল; টুবাই, টুম্পা, তুতুল, মিতামনি/শশীভূষণ বসু রোড, রাধানগর পাড়া; কস্তুরি, পাপড়ি, রুমা, ঝুমা ও মামণি/চিত্তরঞ্জন, এস. পি. নর্থ; সোনালি, সিদ্ধার্থ, উত্তম, গৌতম, কেয়া ও কাকলি/ দুর্গাপুর; অরুণ, রুবিনা, অঞ্জনা, মামণি, উত্তম ও গৌতম হাজরা/বনপাস; সুভায়ণ, শম্পা ও অনিন্দিতা ব্যানার্জী/তেজগঞ্জ, নূতন গঞ্জ; রাণা ও রুম্পা/কোর্ট মোড়, বার্ণপুর; উষণী, কৌশাম্বী, ঝর্ণা, মামণি, মীরা/বাবুর বাগ গভর্মেণ্ট স্টাফ কোয়ার্টার্স; মিঠু, রোজী, লিপি, মালা ও চন্দনা/এম.এ.এম.সি, সি.ডি. দুর্গাপুর-১০; প্রভঞ্জন ও কাঞ্চন সেন/খণ্ডঘোষ; দয়া, অসিত ও অতসী/জয়দেব রোড, দুর্গাপুর-৫; বাণী, সৌরভ, সমাগত/সিটি সেণ্টার হাউসিং কলোনী, দুর্গাপুর-১৬; পার্থ, রাজীব, মুনমুন ও শাশ্বতী/কেওটারা; পাম্পি, টিয়া ও সুপ্রিয় রায়/বড়বেল-গোলা; রত্না, বাবলি, সমু, চুমকি, চিণ্টু/তেঁতুলিয়া; রাম, জীবন, গৌতম, বুড়ো/রাজ হোমিও হল, বৈদ্যনাথ কাটরা; সুমিত, শুভ্র, ছায়া ও অঙ্কুর/কুলটি; অনিরুদ্ধ ও মিঠুন গোস্বামী/শিবাজী রোড, দুর্গাপুর-৪; বিদিশা, বৈশালী ও শ্রাবন্তী দাস/দিশেরগড়; প্রণব, কেশব, যাদব, মাধব, কবিতা ও সংহিতা চৌধুরী/এল.আর-২৫১, এ.বি.এল. কলোনী, দুর্গাপুর; সঞ্জয়, সমীর, সুদীপ্ত/ভিড়িঙ্গী, দুর্গাপুর; রবীন, ননী, শক্তি, শ্যামচাঁদ, পুঁচকে ও বাপী/দুর্গাপুর, কোকওভেন কলোনী; পাম্পা ও রাণা পালচৌধুরী/শান্তিনীড়, কালনা রোড; বাপটু, বজ, বাপুন, তুলি, জগু ও বোতন/রামকৃষ্ণ এভিনিউ, দুর্গাপুর-৪; গীতা, নবনীতা, অভীক, চিত্ত ও অশোক/মহিশীলা, কালীপাহাড়ী; অশোক, সিদ্ধার্থশঙ্কর, শুদ্ধসত্ত্ব, কাঞ্চনজ্যোতি, সৌম্যশান্ত ও স্বয়ম্ভূরঞ্জন ঘাঁটী/মহিশীলা, কালিপাহাড়ী; চুমকি ও মিলি/আপকার গার্ডেন, আসানসোল; গার্গী, গায়ত্রী, মরমী, দেবপ্রকাশ, কৌশিক ও অনুপ রায়/এইচ.এফ.সি কলোনী, দুর্গাপুর-১২; সুমেধা, ঋতুপর্ণ, দেবদ্রুতি, বুটু/বার্নপুর; সুজয়, সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী/মহিশীলা কলোনী, আসানসোল; মমতা, তারাপদ ও অয়ন্ত/সামন্ত হাউস, মেমারী; ধীমান, দীপঙ্কর ও দীপ্তিমান/হর্ষবর্ধন রোড, দুর্গাপুর; টিকলু, মহুয়া, ডালিয়া, চিঙ্কু ও আরও অনেকে/শান্তিপথ, সি-জোন, দুর্গাপুর-৫; স্বপন, প্রবোধ, বাবলু, লালু, অপু, মুতুল/নতুন এগেরো, রাণীগঞ্জ; ঝুমা, প্রদীপ নায়ক/গোগলা; রিচি, রিমি ও সজু/অমরারগড়; কল্পনা বসু ও গৌরী বসু/কালনা; বু, কচন, ফুচু ও কুচু/বড় বেলুন; মণিকা, কণিকা, অলকা, উল্কা ও রাজা, বাদশা/সুকান্ত পল্লী, দুর্গাপুর; সত্যব্রত, সুব্রত, প্রিয়ব্রত ও শুভাশিস চ্যাটার্জী/মাস্টার পাড়া, কাটোয়া; শমু, নীলু ও অপু/বর্ধমান; কাঞ্চন, ছোট্টু, অঞ্জন, সোমনাথ ও মুনমুন রায়/বিধানপল্লী;

॥ মেদিনীপুর ॥

শ্রীলেখা, মণিকা, সুস্মিত ও স্বর্ণেন্দু/গড়বেতা; নভেল, আলেয়া, মহুয়া, অমিতাভ ও উর্মিলা মান্না/ময়না; সীমা ও সাগর বিশ্বাস/সাউথ সাইড, রেল কলোনী, খড়গপুর; মায়া, ইন্দ্রনীল, ঐন্দ্রিলা, ননীগোপাল/ইন্দা রেলওয়ে কলোনী, খড়গপুর; সায়নদীপ আড়ি/হলদিয়া টাউনশীপ; সুনেত্রা ও জর্জ নাগ/বড়বাজার; পার্থ, সুব্রত, বিধান, মাধবী, গৌরী ও কঙ্কণা/ইন্দা রেল কলোনী, খড়গপুর; মৌ, বাপ্পা, বড়, ছোট ও শতাব্দী/ডিগ্রী স্যানেটোরিয়াম; মিঠু, মৌ, পিউ, রিয়া, বাপ্পা, রাম্পা/ইন্দা, খড়গপুর; সুদেষ্ণা, সঞ্চিতা ও তারকনাথ বিশ্বাস/সাউথ ডেভলাপমেণ্ট, খড়গপুর; রঞ্জিত ও শুভদীপ সাহা/গড়বেতা; দিলীপ, রঞ্জিত, মনোজ ও জয়/ইন্দা, খড়গপুর; দোলা ও পার্থ মুখোপাধ্যায়/প্রফেসর পাড়া, গড়বেতা; দিব্যেন্দু, কাকলি, কুহেলি ও সুদীপ্তা দে/খাজরা, কৃশগেড়িয়া; মৌসুমী, শুভেন্দু ও কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য/গড়বেতা, পি.এইচ.সি; রঞ্জন ও চম্পা নন্দী/দুর্গাচক, হলদিয়া; কমল ও সৌভিক/খড়গপুর, রবীন্দ্র ইনস্টিটিউট; তমাল, পলাশ, বাপ্পা, বুম্বা ও কাকলি/রবীন্দ্রনগর;

॥ বাঁকুড়া ॥

আশামুকুল ও বেলা রায়/ময়রাপুকুর, বিষ্ণুপুর; নীতু, রীতু ও পায়েল/বেসিক কম্পাউণ্ড, সারেঙ্গা; প্রণব নারায়ণ দেব/রুদড়া; প্রদীপ, অরুণ, তাপস, যমুনা, তীর্থ ও বাসন্তী গরাই/লালবাজার ডিপুগোড়া, গরাইপাড়া; মিণ্টন, কল্লোল, পার্থ, মৌসুমী, সমাপ্তি ও অষ্টমী খাঁ/মনোহর, মালিয়াড়া; প্রবীর, সুবীর, সুজিত, সুবোধ, সুরজিৎ, বাপ্পা ও তরুণ/পাঁচামী; বিভা ব্যানার্জী, বগলা, সনৎ ও শ্রীকুমার ব্যানার্জী/গুপ্তনাথ; নির্মলেন্দু, উজ্জ্বল, বিপদতারণ, রীণা ও শিখা মাজী/গঙ্গাজলঘাটী; সন্দীপ, সুদীপ ও শর্বাণী/প্রতাপবাগান; মনালিসা পাল/তিলুড়ি হেলথ্ সেণ্টার; পার্থ, মিঠু ও রামানুজ মিত্র/মুক্তাগেড়; চিত্তরঞ্জন, বয়লাল, তরুময় ও দাদুভাই/তিলুড়ি; বাবুলাল, উত্তম, গৌতম ও তড়িৎ দে/তিলুড়ি; সুচিত্রা, সোমা, বিজয়া, মৃদুলা, লক্ষ্মী ও কাকলি রায়/তিলুড়ি, 'মণিমেলা'; পারমিতা ও মনোজকুমার/কুলডিহা, সারেঙ্গা; বৈদ্যনাথ, সোমনাথ ও রুদ্রেন্দ্র রায়/ময়রাপুকুর, বিষ্ণুপুর;

॥ পুরুলিয়া ॥

খোকা, টুকুন, বাপি ও মাণিক/আদ্রা; দুর্গাদাস ও দেবারতি/চেলিয়ামা; স্বপন, দূর্বা ও দীপক চক্রবর্তী/মানবাজার; দিলীপকুমার চৌধুরী/মধুপুর, মানবাজার; অর্ণব সেন/আর.কে. মিশন বিদ্যাপীঠ; শ্যামল, দীপু ও তপু/মানবাজার হাসপাতাল, মানবাজার; বাপি, টুকু, মিঠু, টিঙ্কু, পাপাই/আই.টি.আই, রঘুনাথপুর; দিব্যেন্দু, শুভেন্দু, অরিন্দম ও আইভি/ আমডিহা; বুবাই, তোতন, আদিত্য, শিবাণী, সন্তোষ, নব, বিদ্যুৎ ও সহদেব/মানবাজার, দুলাল; পরেশ, মিতা, মিঠু, ঈশানী ও সাণ্টু/চেলিয়ামা;

ভাদ্র সংখ্যার ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নাম

॥ কলকাতা ॥

পাপিয়া, প্রতাপ, পূরবী, প্রদীপ, জগন্নাথ ও গাবলু অধিকারী/বি.এল. সাহা রোড, টালিগঞ্জ; সোলু, টুলু, রীনা, বাবু, পলি, জুলু ও রীপা/তিলজলা রোড; মিতা ও পার্থ বিশ্বাস/নাজির লেন, খিদিরপুর; সন্তদীপা মুখার্জী/বালিগঞ্জ গার্ডেন্স; রুমা নন্দন ও স্বপন নন্দন/কাঁসারী পাড়া রোড, ভবানীপুর; মালা, তনু, পাবু, টাবু, রাজা ও যীশু/বিজয়গড়; ইলোরা ও ইন্দিরা রায়/গাঙ্গুলীবাগান; অমিতাভ, উৎপল, প্লাবনজিৎ, নিবেদিতা, পারমিতা, অনিন্দিতা/দমদম ক্যাণ্টনমেণ্ট; দুষ্টু ও মিষ্টি/লী রোড; পাপা ও মুন্না দত্ত/গড়িয়াহাট রোড; পুষণ ও মিতা/রায় বাহাদুর রোড,

বেহালা; লীনা বিশ্বাস/ফাল্গুনী এস্টেট, সল্ট লেক; তীর্থঙ্কর, মানসী ও দীপঙ্কর চ্যাটার্জী/সুভাষনগর, দমদম ক্যান্টনমেন্ট; শিখা, শিপ্রা, খোকন, বাপ্পা/নাজির লেন, খিদিরপুর; অরুণিমা, অমৃতা, কৌস্তুভ ও কৃষ্ণা ঘোষ/সূঁড়া থার্ড লেন, বেলেঘাটা; সুদীপ, অর্ঘ্য, দেবকী, স্বাতী ও শ্রাবন্তী সরকার/গার্ডেন রীচ; শুভ্রা, কৃষ্ণা, পূর্ণিমা, ঊর্মি ও অনামিকা/বেলঘরিয়া, সি. পি. এস্টেট; সুখেন্দু, শ্রীলেখা, সুদক্ষিণা ও দক্ষিণী ভট্টাচার্য/সুরেন সরকার রোড; রবি, রেখা, সীমা ও জয়ন্তকুমার বৈদ্য/নিউ সন্তোষপুর মেন রোড; সুদীপ্ত নাগ/জপুর রোড; শুভ্রমাল্য, শ্রাবণী, স্রোতা, দ্যুতি, মমতা, চয়নিকা, কৃষ্ণা, শিবা ও বুলি/ষষ্ঠীতলা, অটলবিহারী বোস লেন; শ্যামল, বিশ্বজিৎ, তপন, স্নেহময়, সুহাস, অচিন্ত্য, গৌতম ও রতন/ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, ক্যানিং স্ট্রীট; সুস্থির, মৈনাক, ছন্দা ও গার্গী মিত্র/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, বেদিয়াপাড়া; জয়দেব, স্বপ্না ও দেবস্মিতা দাশগুপ্ত/কামারপাড়া, যাদবপুর; বাবু, রেশমা/টিচার্স হোস্টেল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়; চন্দন, পলাশ ও রক্তিম নাগ/বাঘাযতীন, তালপুকুর; কৌশিক, শঙ্কর, বিশ্বজিৎ ও শর্মিষ্ঠা/গোপালচন্দ্র লেন, কলুটোলা।

।। হাওড়া ।।

অভিজিৎ, অস্মিতা ও সারদা/ইছাপুর রোড, কদমতলা; প্রদীপ, কাবেরী ও কৃষ্ণা বসু/মধুসূদন বিশ্বাস লেন; শাশ্বতী, শান্তনু ও বুম্পা/সালকিয়া; পুণ্ডরীকাক্ষ মজুমদার ও পদ্মলোচন বাঘ/বাঁকসাড়া; সুশীল, মিঠু, পৌলমী ও সৌম্য দাশ/জয়নারায়ণ বাবু ও আনন্দ দত্ত লেন, খুরুট; কৌশিক, আশিস, পার্থপ্রতীম, স্মৃতিময়, পাপাই, বন্দনা ও সুনন্দা ঘোষ/আন্দুল পূর্বপাড়া; সৌরাশিস, কৃষ্টি, সুখেন ও হিরণ/কলাবাগান লেন, সাঁত্রাগাছি; অনুষ ও মণীষা হাজরা/ঝোড়হাট; শ্রীজাতা গুপ্ত/নিতাইচরণ দত্ত লেন; উপালী মৈত্র/আন্দুল রোড; মধুমিতা চক্রবর্তী/রামকিনু সরকার লেন; প্রীতম ও প্রিয়ব্রত/ইছাপুর রোড; নির্মলেন্দু ও রমেশচন্দ্র দত্ত/বারুইপাড়া, ডোমজুড়; মৌসুমী, মহুয়া, পাঁপড়ি, পারমিতা ও সৌরভ বসু/অবিনাশ ব্যানার্জী লেন, শিবপুর; প্রতীম ও কৃষ্ণা গুঁই/মন্দিরপাড়া, দাশনগর; অজন, সৃজন, অমর/গোবিন্দপুর পশ্চিম; তাপস ব্যানার্জী/সাঁকরাইল; সন্দীপ মুখার্জী/নীলমণি মল্লিক লেন।

।। হুগলী ।।

জয়ন্ত, সুকান্ত, মনা, মধু ও বাপন/সুপাড়া, আরামবাগ; শুভঙ্কর, মহুয়া ও পিন্টু চক্রবর্তী/হরিপাল; শিক্ষার্থী ও বিদ্যাবিদ বন্দ্যোপাধ্যায়/বেহুলা; লক্ষ্মীনারায়ণ সাউ/রোলসেন্টার, পিপুলপাতি; কালি, ফান্টু ও শ্যামল/ঘুটিয়াবাজার, কালীতলা; লোপামুদ্রা, দেবযানী, সৈকত ও সুবীর নন্দন/মাক্কের সড়ক, বাঁশবেড়িয়া; সঞ্জয় ও সৈকত দত্ত/জ্ঞাননগর রোড, মাহেশ; রমা, অচিন্ত্য, প্রশান্ত, জয়ন্ত ও স্বরূপ/আরামবাগ; সুদীপ্ত তপন সিংহ/বিদ্যাসাগর রোড, নবগ্রাম; শাখী, শুভ্র ও অনুশ্রী গাঙ্গুলী/নিত্যানন্দপুর, কুন্তিঘাট; রঞ্জন গাঙ্গুলী/হুগলী; রঞ্জন, সন্দীপন, সুতপন, মঞ্জু, মৌসুমী ও মিতালী/বাসুদেবপুর, ত্রিবেণী; দেবাশিস ও স্নেহাশিস চট্টোপাধ্যায়/ললিতমোহন ভট্টাচার্য, শ্রীরামপুর; মঞ্জুয়া, মিনারা, মিঠু, জসীম ও জাহাঙ্গীর/ডানকুনি, চাকুন্দি; মধুমিতা নিয়োগী ও অঞ্জনা চ্যাটার্জী/হুগলী; মীনাক্ষী, রাধানাথ, বিবি ও বাসব চট্টোপাধ্যায়/বড়বাগান লেন, শ্রীরামপুর; বিশ্বনাথ, কল্পনা, বাবি ও গেবো চ্যাটার্জী/নিত্যানন্দপুর; নবনীতা, প্রদোষ, রূপা, রাজু, উত্তম, আশিস, অমিত, চন্দনা, সোনালী, পীযূষ, রাকেশ, অলোক, অঞ্জনা, প্রত্যূষ, সুকেশ/মান্দারণ, লিচুবাগান; রাজা, রাণা, বাপী, মল্লিকা, বিমল, মীরা/ব্যানার্জীপাড়া, চন্দননগর; শ্যামাপ্রসাদ, সুপর্ণকান্তি, বুনি ও বিনি/কয়াপাট; আসিফ ইকবাল, মহম্মদ ইসমাইল ও বেগম হাসিনা আক্তারী/জি. টি. রোড, শেওড়াফুলী; মৈত্রেয়ী, মৌসুমী, বিংকি ও ঝুনঝুন/ত্রিবেণী, হুগলী।

।। ২৪ পরগণা ।।

সংহিতা কুণ্ডু/পঞ্চাননতলা, চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর; সোমনাথ পাল/আব্দুল জব্বর রোড, কাঁচড়াপাড়া; দীপ্তিরাণী মিত্র/নহাটা, সারদা সুন্দরী বালিকা বিদ্যামন্দির; সুস্মিতা, স্বাগতা ও শেফু নাগ/মল্লিকভিলা, ইছাপুর; চণ্ডীদাস ও অমরেন্দ্র দত্ত/উন্তি; খোকন, সুনীতা, প্রদীপ, মান্টা, কল্পনা, প্রবীর, দেবশ্রী, আনোয়ারা, লাইলি ও সাজাহান/সূর্যপুর, বারুইপুর; বিজয়, কর্ণা, সুজয়, মন্টি ও অনুরাধা সাহা/আনন্দপুরী, ব্যারাকপুর; মিকেল, টুনটুনি ও মোমপু/রায়পাড়া রোড, গরিফা, নৈহাটি; সুস্তা, কাকলি ও প্রসাদ/ক্যানিংহাম রোড, নৈহাটি; বাসুদেব ঘোষ/ঘটক রোড, কাঁচড়াপাড়া; শুভ্রা ও সুব্রত দত্ত/সরোজ পার্ক, বারাসাত; পার্থ ও জয়া গোস্বামী/নিবেদিতা পল্লী, ন'পাড়া, বারাসাত; কুটি, বাপি, বাবু ও তন্দ্রা ভট্টাচার্য/মধ্যমগ্রাম, বিজয়নগর; অরুণ, তরুণ, গোপাল, চন্দন, শংকর ও বাপি চক্রবর্তী/গাঁতি, সারদাপল্লী; বাবান ও পিসীমণি/পানিহাটি, কাঁসারিপাড়া; দীপংকর, রাকা, শান্তনু ও বৈশালী মিশ্র/দক্ষিণ চাতরা; সুজয় ও শুভ্রা ব্যানার্জী/নবপল্লী, গড়িয়া; অরিন্দম, অরুণ, শুভ্রমাল্য, সমীর, মমতা, দীপিকা, মলয় ও রীতা/ইছাপুর, আনন্দমঠ, সি ব্লক; রিণি চ্যাটার্জী/নওয়াপাড়া, শ্যামনগর; অনিন্দিতা, অমিতাভ, মিনতি ও শুভেন্দু রায়/গ্রাম+পোঃ সডা; অনির্বাণ, প্রবাহন, কাঞ্চন, ইন্দ্রনাথ ও কল্পনা/বাসুদেবপুর রোড, শ্যামনগর; মৌমিতা ও অভিরূপ মুখার্জী/সুখচর; টুলু পাল/হরলালনগর, কাঁচড়াপাড়া; দেবযানী, বনানী, রত্না, নন্দিনী/গোবরডাঙা, বাবুপাড়া; সৌমেন নন্দী ও শুভেন্দু নন্দী/রাসবিহারী স্কুল রোড, ন'পাড়া, বারাসাত।

।। মেদিনীপুর ।।

সৈকত, বর্ণালী ও সৌগত/খাড়তলা; সৌভিক ও কমল/রবীন্দ্র ইনস্টিটিউট, খড়্গপুর; সব্যসাচী, সুরজিৎ, শুভাশিস, সম্রাট ও শিবাজী কোলে/নিমপুরা; নভোনীল, পলাশ, সুমন ও দেবকুমার/নন্দীগ্রাম; এস. কে. মণ্ডল ও বি. এন. মণ্ডল/রেলওয়ে বাংলো, খড়্গপুর; রঞ্জন ও চম্পা নন্দী/দুর্গাচক, হলদিয়া; দিলীপ, রজত, মনোজ, জয়, শুভ্রজিৎ ও অনুরাধা/ইন্দা, খড়্গপুর; টুকু, ফুলুক ও বাণ্টু/বার্জ টাউন; সুদেষ্ণা, সঞ্চিতা ও তারকনাথ বিশ্বাস/সাউথ ডেভলাপমেন্ট, খড়্গপুর; অর্ধেন্দু, আলোক ও পুলক/রাঙামাটি; কুচু, টুবু ও ভোম্বল/পাহাড়ীপুর; সোমনাথ ও রণজিৎ/খড়্গপুর; দিব্যেন্দু, কুহেলী, কাকলি ও সুদীপ্তা দে/খাজরা; অশোক, সুমিতা, অরূপ, শ্রাবণী, সুদীপ, সুমনা, শর্মিলা, সন্দীপ ও গোপী হাজরা/গড়বেতা; টুলু, বুবু, টুটু/তালবাগিচা, খড়্গপুর; অয়ন ও অদিতি সামন্ত/খড়্গপুর, গোয়ালাপাড়া।

।। উত্তরবঙ্গ ।।

রঞ্জন, উত্তম, বুলবুল, মন্দিরা ও আনন্দ/পুড়াটুলি, রাজেন্দ্র বাবু লেন, মালদা; বিভাস ও শুভেন্দু/গৌড় রোড, মালদা; সুধীর, সমীরণ, সন্দীপন, পাপা, লাল্টু, ইন্দ্রজিৎ, মান্তু, বিল্টু, টুম্পা, শম্পা ও মৌ/বাবু পাড়া, মালদা; সুমনা ও চয়ন/বিবেকানন্দ পল্লী, মালদা; জয়দীপ ও চিরদীপ চক্রবর্তী/হাউসিং এস্টেট, মালদা; অমিতাভ ঘোষ/এ. পি. সি. সরণী, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি; অপু, পাপু, কাজল, বুমু, বাপ্টি, বনা ও বুম্বা/দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি; সুকন্যা দেবনাথ/আকাশবাণী, শিলিগুড়ি; মুন, রুবলু, রাজা, জয়, টিনা, কাকলি ও রিস্কু/কালচিনি চা বাগান, জলপাইগুড়ি; সুস্মিত ও সোমা দত্ত/কালচিনি, জলপাইগুড়ি; জনা, রুণা, মানসী ও অচিন্ত্য/নয়াবস্তী, জলপাইগুড়ি; অঞ্জনা, প্রশান্ত, অনিন্দিতা ও বিউটি/রায়গঞ্জ, পঃ দিনাজপুর।

।। বিহার ।।

সোমা, অনিন্দা ও অনানারা/ভোজুড়ি, ধানবাদ; কণিকা, শৈলেন, রেবা, সুভাষ ও সুলতা/হীরাপুর, ধানবাদ; শাশ্বতী, স্বাতী, রথীন, নিমাই, বাবন ও সুমন/কয়লানগর, ধানবাদ; টিঙ্কু, পায়েল, বাপ্পা, বিশ্বজিৎ, অমিতাভ, সোমনাথ ও রুবি চৌধুরী/জে. সি. মল্লিক রোড, হীরাপুর, ধানবাদ; মৌটুসি, বৈশালী ও দিলীপ/সাউথ সেটেলমেন্ট, টাটানগর।

বাকি উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায়

পৌষ সংখ্যার শব্দমালার উত্তর

					■	আ	■					
					বৈ	কা	ল					
					■	ল	■					
			আ	মৃ	র	■	সৃ	র	তি			
			লা	■	ব	থ	রা	■	তি			
■	ব	■	ল	রা	■	গ	■	প্রে	ক্ষা	■	চা	■
শ	য়	ন	■	জ	রা	■	থ	র	■	আ	উ	ল
■	সা	■	ব	না	■	শ	■	ক	ই	■	ল	■
			রা	■	উ	লা	র	■	য়া			
			ত	ৎ	মা	■	গ	ত	র			
					■	হা	■					
					কা	ন	ন					
					■	য়	■					

ছবির মজা

মানব বন্দ্যোপাধ্যায়

পাগলা টুপি

টুপিটি লম্বায় (ক–খ) বড় না চওড়ায় (গ– ঘ) বড় ?

"সর্বকালের সেরা অ্যাথলিট" –হলেন এমিল জাটোপেক। হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে ম্যারাথন, ৫ ও ১০ হাজার মিঃ দৌড়ে প্রথম হন।

সংখ্যাতত্ত্বে শূন্যের ধারণা পৃথিবীকে দেন প্রাচীন ভারতীয় – আর্যভট্ট

সমুদ্রের সাপ। এক সময় এরা ছিল স্থলের প্রাণী। কোনো এক কারণে সমুদ্রে আশ্রয় নিলেও বাতাসের জন্য উপরে উঠতে হয়। বিষধর এই সাপেরা থাকে ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে।

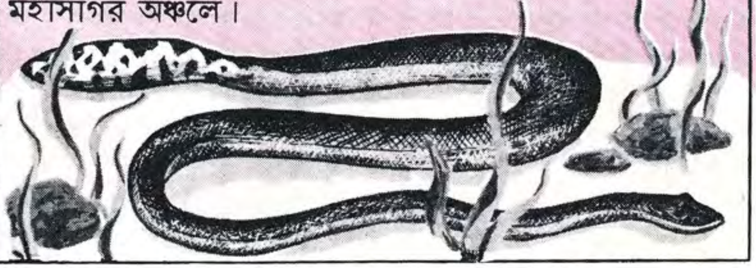

ছবির মজার সমাধান

* সম্ভবত চোখ বোকা বনেছে। আসলে পাগলা টুপির দুই দিকই সমান। সাধারণত আমরা সমান্তরাল দূরত্ব একটু বেশি ভাবি। তা সে বাড়ি হোক কিংবা কাগজে আঁকা ছবি হোক।

* ১ থেকে ২, ২ থেকে ৩ এইভাবে সংখ্যাগুলি জুড়ে দিলে দেখা যাবে যাদুকর ম্যানড্রেক একটা ঘর উল্টে দিয়েছেন।

আফ্রিকার জঙগলে

অমিয়কুমার হাটি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

এবার যাবো নাকুরু হ্রদ।

ভ্রমণ সংস্থাটি খদ্দের জোটাতে কত চেষ্টা করল পিকআপ ভ্যান নিয়ে নাইরোবি শহর ঘুরে ঘুরে। উঠলো শুধু তিনজন—লন্ডনের এক তরুণী অ্যান, নিউইয়র্কের জ্যাক ও কলকাতার আমি।

সেই গাড়ির চালক কিন্তু কেন জানি না, ভারতীয়দের ভাল চোখে দেখে না বলে মনে হলো। ও বলছিল, "ভারতীয়রা এখানে ব্যবসা করতে আসে, শুধু টাকা জমিয়ে রাখে, খরচ করতে চায় না।"

নাইরোবিতে সত্যিই অনেক সম্পন্ন ভারতীয় ব্যবসায়ী আছেন—সিন্ধ্রী, গুজরাটি, দক্ষিণী, শিখ প্রভৃতি। চালক বলছিলো, ১৯৮২তে এ শহরে মারপিট হয়েছিল, ভারতীয়দের দোকানপাট ঘরদোর লুট হয়েছিল।

তখন ঐ পিকআপ ভ্যানে আমি একা। তবু বললাম— "জানো, আমি ভারতীয়।"

—"জানি। তবে তুমি বিদেশী, যাঁরা এখানে আছেন তাঁদের কথা বলছি।" এসব কথা বেশিদূর এগুলো না অ্যান আর জ্যাক উঠে পড়ায়। কেমন অস্বস্তি লাগছিল।

পিকআপ ভ্যান তুলে দিল অন্য একটা জীপে। নাইরোবি ছাড়িয়ে এবার আমাদের তিনজনকে নিয়ে পশ্চিমে ছুটে চলেছে গাড়ি। সারা আফ্রিকারই যেন বুনো চেহারা—শহরগুলো বাদ দিলে। যেন বন দিয়ে ঘিরে রেখেছে শহর। 'দাও ফিরে সে অরণ্য'—এ প্রার্থনার সব থেকে বড় শরিক বুঝি আফ্রিকা।

কোথাও ছোট গাঁ, লোকজন কম, টিনের চাল, কাঠের বেড়া দেওয়া ঘর। কোথাও বা পাথরের দেয়াল, ছাদটা টিনের বা টালির। খালি পায়ে আফ্রিকার কোনো গাঁয়ের কুচকুচে কালো মেয়ে চলেছে, পিঠে বোঝা। মাটি লাল, বীরভূমের মতো। কোথাও বা বাসরাস্তা থেকে লম্বভাবে বেরিয়ে দুপাশে সবুজ দেওয়াল, যেন সবুজ কার্পেটে মোড়া—চলে গেছে ছোট ছোট বসতবাড়ি পর্যন্ত। খুব সুন্দর দেখতে। প্রাকৃতিক পরিবেশে এই রুচির প্রশংসা করতেই হয়। কোথাও বা রাস্তার ধারে বাঁশ দিয়ে ছোট ছোট মাচার মতো তৈরি করা আছে। বসেছে দোকান। হয়ত কোনোটায় ফল সাজানো, গোঁড়ালেবু, কোনোটায় আলু। কখনো দেখছি গাধায় টানা গাড়ি। আবার কোথাও বা মাঠে চরছে গাধা। এগুলো পোষা গাধা। আফ্রিকায় এক সময় পাওয়া যেতো বুনো গাধাও। ভুট্টাখেত কোথাও, এক জায়গায় অনেকটা জায়গা জুড়ে বাঁধাকপির চাষ। ছোট ছোট মোটর ভ্যান বোঝাই করে লোকজন, জিনিস-টিনিস যাচ্ছে। জিনিসগুলো ছাদেও আছে, তবে মানুষ বোঝাই নেই ছাদে। কোনো কোনো মোটর ভ্যান ভর্তি আনারস। আনারসের খেতও ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে।

কখনো ঘন বনের ভিতর দিয়ে চলে গেছে পথ। পাইন বন। হয়ত নতুন লাগানো। ধ্বংস উপত্যকা দুধারে। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি নাকি লুকিয়ে আছে। তা থাক, এখন কোথাও তার টিকিটি নেই। দুধারে শুধু সবুজের সমারোহ। আর আকাশ ভেঙে মেঘ, বেশ শীত শীত ভাব, আলো একটু

ঘোলাটে, তবে বৃষ্টি নেই। একপাশে বা কখনো কখনো দুপাশেই পড়ছে ছোটখাট পাহাড়। পাথর বিছানো এই পাহাড়গুলো নানা ধরনের—বুড়ো আঙুলের মতো, স্তূপাকার, ছুঁচলো, লম্বা, টিনের বা খড়ের চালের মতো,দেওয়ালের মতো, চূড়ার মতো, গোল বা চৌকো টেবিলের মতো। সবগুলোই আগাগোড়া সবুজে ছাওয়া—দেখতে বেশ মজাই লাগছিল যেন নানা ধরনের খেলনা সবুজ পাহাড়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে।

একটু পরেই একটা হ্রদ। ছোট ছোট লাল ঘাস তার জলে জেগে। না, শালুক এগুলো নয়। বেশ বাহারী। হ্রদের খানিকটা জায়গা যেন লাল কার্পেটে মোড়া। এরই পাশে পথের ধারে বাবলা গাছে গাছে ঝুলছে লম্বা ঢোলকের মতো কী সব! শুধিয়ে জানতে পারলাম, এইভাবেই এখানে কৃত্রিম মৌমাছির চাষ করা হয়।

ফুল তেমন কোথাও নেই। এক জায়গায় শুধু দুলছিল হলদে বনফুল। আর রাস্তার ধারের দু একটা হোটেলের সামনে রয়েছে গোছাগোছা বেগনভেলিয়া।

এবার জঙ্গল আরম্ভ হলো। কিছু রাধাচূড়ার মতো গাছে হলদে ফুল। আছে অ্যাকাশিয়া বা বাবলা এবং ছোট ছোট পাহাড় থেকে উঠেছে নানা আকারের ফণীমনসা। অনেকগুলো তাদের বাহু, যেন বিরাট বিরাট অক্টোপাশ আকাশে ঐ বাহুগুলো মেলে আকাশ আঁকড়ে ধরতে চাইছে। কোনো কোনো ফণীমনসার গাছ একতালা বা দোতালার মতো। জলা জায়গা অনেকখানি। এ বনেও আছে গ্যাজেল, ইমপালা, বুশ বাক, ওয়াটার বাক—এরাও অ্যান্টিলোপ, হরিণ নয়, তবে হরিণের মতো। আছে বেবুন এবং ছোট কালোমুখো হনুমান। গাছ থেকে নেমে এসেছে। যেন অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, জীপ গাড়ির পাশে পাশে এগিয়ে!

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আসতে আসতেই হ্রদের গোলাপী আভা চোখে পড়ছিল। হ্রদের জলের রঙ কি এমন হয়? হতেও পারে! একটু আগেই লাল ঘাস দেখছিলাম আর একটা

বুশ বাক,—এরাও অ্যান্টিলোপ, হরিণ নয়,

হ্রদে! হঠাৎ চোখে পড়লো, একটা পাহাড়ের কোলে বিশাল এক হ্রদ। একটা সমবেত কাকলী—অস্ফুট গুঞ্জন—প্রায় সারা হ্রদটার জলে দুলছে, ভাসছে—ওগুলো কি পদ্ম? না, জলগোলাপ?

ওরাই ফ্লেমিংগো পাখি!

কেউ কেউ বলে দশ লাখ ফ্লেমিংগো পাখি আছে ঐ হ্রদে! বকের মতো বড় গোলাপী আভার পাখিগুলো উড়ছিল যখন আকাশে ডানা মেলে, মনে হচ্ছিল উড়ছিল যেন গোলাপ! সারা পৃথিবীতে যত ফ্লেমিংগো আছে, তাদের অর্ধেকের বাস এইখানে। হ্রদের জল প্রায় দেখাই যাচ্ছে না—ছেয়ে আছে ফ্লেমিংগোতে আর একদিকে এদের থেকে বড় একদঙ্গল পাখি—তবে সংখ্যায় ফ্লেমিংগোদের থেকে অনেক কম এরাও

কেউ কেউ বলে দশ লাখ ফ্লেমিংগো পাখি আছে ঐ হ্রদে!

বড় সুন্দর–পেলিক্যান! চান করছিল অগভীর জলে ডুবে ডুবে।

একটা ওয়াটার বাক চলে গেছে তীর ঘেঁষে ফ্লেমিংগোদের দিকে। চেয়ে দেখছে ওদের, উদাস হয়ে ভাবছে কিছু! নাকি ও-ও প্রকৃতির এই অনবদ্য সৌন্দর্য উপভোগ করছে?

নাকুরু সংরক্ষিত বনে (২০০ বর্গ কিলোমিটার) এ অপরূপ সৌন্দর্যের তুলনা মেলা ভার। আরো কতরকমের পাখি–একটার নাম মারাবাক। জলার কোথাও বা সারস, একা, পাহাড়ের নিচে–একটা পা দিয়ে অন্য পা জড়িয়ে আছে–ঐ একটা কালো পাখি–সাপ ধরেছে কি? লম্বা কি ঝুলছে? না–না সাপ নয়–সাপের মতো লম্বা ঐ লেজ দুলছে হাওয়ায় ঘাসের উপর। নামটা পাখির–ওয়াভার। এবং ওই পরিচিত পাখি–ময়ূর–বোধ হয় অন্য জাতের, আগে লোকে জানত না–এ ধরনের ময়ূরের খবর জানা গেছে ১৯৩৭ সাল থেকে–আফ্রিকার বনে। শুধু ৪০০ ধরনের পাখিই আছে কেনিয়ায়।

আমরা যেন ভি আই পি–ফ্লেমিংগোদের সেলাম নিতে নিতে চলেছি তীরভূমি ধরে। এক জায়গায়–ফ্লেমিংগোগুলো খুব ছোট–হয়ত এরা বাচ্চা ফ্লেমেংগো–

কিন্তু না–ফ্লেমিংগো আছে দু ধরনের। বড় ফ্লেমিংগো বা গ্রেটার ফ্লেমিংগো এবং ছোট ফ্লেমিংগো বা লেসার ফ্লেমিংগো।

লক্ষ লক্ষ ফ্লেমিংগো। রোজই তাদের সভা বসে বুঝি। খাবার কোথা থেকে পায়? খায়ই বা কি?

ফ্লেমিংগোরা আবার নিরামিশাষী–মাছ খায় না, খায় জলের শ্যাওলা, নীলসবুজ শ্যাওলা এবং আরো সব খালি চোখে দেখা যায় না এমন উদ্ভিদ–যেমন ডায়াটম। ও কিসের উপর বসেছে ফ্লেমিংগো পাখি দুটো? জলের কিনারায়? ও তো একটা হিপো–হিপোপটেমাস! আফ্রিকার আরেক বিশাল জীব! ওজনে হতে পারে ২০০০ কিলোগ্রাম। একটা দুটো নয়, গোটা ৭/৮ ভাসছে। একটা বাচ্চা হিপো উঠে বসেছে তার মায়ের পিঠে। জলেই বাচ্চা জন্মাতে পারে, জলেই মায়ের দুধ খেতে পারে এরা। হিপোপটেমাসগুলোর নাক চোখ আর কান দুটো ভাসছে জলের উপর।

আরে, ও কি?

বেশ খানিকটা দূরে কাদাভরা জায়গায় কাদা মেখে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুটো হিপো মুখ হাঁ করেছে।

ও দুটোই পুরুষ হিপো–'রণং দেহি' ভাব। তেড়ে আসছে, তাদের লড়াই শুরু হবে বুঝি এখুনি! হঠাৎ একটা হিপো হাঁ করা মুখ বুজলো। চালক বলল, "ও বুঝেছে হেরে যাবে। তাই পরাজয় স্বীকার করল। লড়াই দেখা আর আমাদের হলো না।"

তাই হলো। লড়াই বাধলো না। যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই–এই মনোভাব ওদের মধ্যেও ছড়াচ্ছে।

হিপোপটেমাসের চামড়া খুব মোটা। হলে কী হবে? শ্বদন্ত তাদের তেমনি ধারালো। লড়াই বাধলে ঐ দাঁত দিয়ে মোটা চামড়াও ফালা ফালা করে দেয়। পুরুষদের শরীরে এরকম লড়াইএর দাগ অনেক দেখা যায়।

জলের গাছপাতা খায় এরা। কোথাও খাবার ঘাটতি পড়লে জলে থেকে উঠে ডাঙাতেও চরতে আসে। রাতে ৫/৬ কিলোমিটার দূরেও খাবার খোঁজে যায়, আবার ফিরে আসে তার জলাভূমিতে। মোটা তাতে কি? মানুষের থেকে জোরে ছুটতে পারে হিপো!

নাকুরু লজ-এ চর্বচোষ্য খেয়ে, আরো কিছু ময়ূর দেখে ফিরে চলেছি। ঘন বন তখনো শেষ হয়নি। হঠাৎ সাহেবের চীৎকার–"সাহায্য করো, সাহায্য করো..."

কী ব্যাপার?

গাড়ি ঘুরিয়ে চললাম।

[চলবে]

জানো কী

☐ পাঁচবছরের মেয়ে স্কুল থেকে চুরি হয়ে গেলো। তাকে খুঁজে বের করতে এগিয়ে এলো পান্ডব গোয়েন্দারা। তারপর কি হলো?

☐ গড় চামুন্ডেশ্বরের আগের এগারোটি মূর্তির মতো শেষটিও সেদিন ভেঙে পড়লো। কেন?

☐ মহাশূন্যে ঘটে গেলো এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ। তারপর কি হয়েছিলো?

☐ সাহস দেখাতে গিয়ে দুই বীরপুরুষ কিসের পাল্লায় পড়েছিলো?

☐ পৃথিবীটা স্বর্গের চেয়েও সুন্দর হবে কি করলে?

এই সব প্রশ্নের উত্তর পাবে শুকতারার ফাল্গুন সংখ্যায়। সেই সঙ্গে আরও অনেক কিছু। ফাল্গুন থেকেই শুকতারার নতুন বছর শুরু। নতুন বছরের শুকতারা আরও ভালো, আরও সুন্দর, আরও ঝলমলে হবে। ঠিক যেমনটি তোমরা চাও।

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে! তা শীতের সময় ভালো তো থাকবেই। এখন তো শুধু মজা আর মজা। হু হু করে ছুটে আসছে হিমেল হাওয়া। কাঁপুনি লাগায়। কাঁপতে কাঁপতেই ক্রিকেট মাঠে। শীতকালটা দারুণ না? যেমন খাওয়া-দাওয়ার সুবিধে তেমনি খেলার। তার ওপর এই মাসে আবার সরস্বতী পুজো। পাড়ায় পাড়ায়, স্কুলে স্কুলে পুজোর মেলা। তোমাদের তো এখন কতো কাজ। বিদ্যার দেবী সরস্বতীর আরাধনা—সোজা কথা তো নয়! যাদের বাড়িতে পুজো তাদের তো আরও মজা। আমাদের ছোটবেলায় সরস্বতী পুজোর আগে আমরা কেউ কুল খেতাম না। পুজোর পরেই শুরু হতো কুল খাওয়ার ধুম। এখন তো আর ওসব নেই। ওদিকে আবার সরস্বতী পুজোর ক'দিন পরেই কলকাতায় টেস্ট ম্যাচ। ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের। সব মিলিয়ে এই মাসে তোমরা দারুণ ব্যস্ত।

এই মাসের আবহাওয়াটা কেমন খেয়াল করেছো? শুকনো শুকনো। ঠোঁট ফাটে গা হাত পা ফাটে। খুব করে সরষের তেল গায় মাখলে তবে রক্ষে। মাঘ মাসের গোড়ার দিকটা হাড়-কাঁপানো ঠান্ডা। মাঝামাঝি থেকেই শীতটা কমতে শুরু করে। দিনও একটু একটু করে বড় হচ্ছে। তবে রাত্তিরকে এখনও হারাতে পারেনি। এখন সকালবেলায় কুয়াশা। বিকেলে ধোঁয়াশা। নানা রকম শীতের ফুলের সঙ্গে গাঁদা বাগান আলো করে রাখে। এই মাসে খেয়াল করে দেখো, আম গাছে মুকুল ধরবে। বাতাসে ভেসে বেড়াবে একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ।

আকাশের দিকে তাকালে দেখতে পাবে ছায়াপথ উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে গেছে। কুম্ভ রাশি পশ্চিম আকাশে আস্তে আস্তে চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। পুব আকাশে দেখা দিয়েছে কর্কট রাশি আর সিংহ রাশির খানিকটা। তোমাদের তো আগেও বলেছি সিংহ রাশির 'মঘা' নক্ষত্রের নাম থেকেই এই মাসের নাম মাঘ।

এই যে আমি প্রায়ই রাশি-টাশির নাম লিখি—ওগুলো কী বলো দেখি! তোমরা তো হরদম শুনছো অমুকের অমুক রাশি, তমুকের তমুক। কিন্তু ব্যাপারটা যে কী তা আমরা অনেকেই জানি না। কিন্তু তোমাদের তো জেনে রাখতে হবে—শুকতারার বন্ধুদের কোনো বিষয়েই হারলে চলবে না। তাই ব্যাপারটা জেনে রাখো।

আকাশের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে কি দেখবে? দেখবে অর্ধবৃত্তাকার আকাশ বা আধখানা আকাশ। বাকি আধখানা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ব্যাপারটা কি রকম জানো? এখন তো খুব কমলালেবু পাওয়া যাচ্ছে—একটা কমলালেবুই হাতে নাও। আমাদের পৃথিবীটা অনেকটা ঐ কমলালেবুর মতো। লেবুটা যদি মধ্যিখান থেকে কেটে ফেলো তাহলে সেটা অনেকটা ঐ আমাদের অর্ধবৃত্তাকার আকাশের মতো হবে। জুড়ে দিলেই পুরো পৃথিবীর আকাশ। ঐ পুরো আকাশ দিয়েই সূর্যের চলার পথ। আমরা তো রোজই সূর্যকে পুব থেকে পশ্চিমে চলতে দেখি। ঐটাই সূর্যের পথ। তবে সূর্য কিন্তু রোজই পুব দিকে এক ডিগ্রি করে সরে যাচ্ছে। এই এক ডিগ্রি এক ডিগ্রি করেই সূর্য তারাদের মধ্যে দিয়ে এক বছরে এক পাক ঘুরে নেয়। একে বলে সূর্যের বার্ষিক পথ।

ও সব কথা থাক। মনে রেখো সূর্যের চলার পথে তারাভরা আকাশে আগেকার দিনের জ্যোতির্বিদরা বারোটি মূর্তি কল্পনা করেছিলেন। এই বারোটি মূর্তিই হচ্ছে আমাদের রাশি চক্রের বারোটি রাশি। নামগুলো মনে আছে কি? বারোটি রাশির নাম হলো—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ আর মীন। এর মধ্যে সাতটিতে জীবজন্তুর, দুটিতে মানুষের আর বাকি তিনটিতে অপ্রাণীবাচক বস্তুর মূর্তির মতো ছবি আছে। মানুষের জন্মমুহূর্তে চাঁদ তারায় তারায় আঁকা যে চিত্রকক্ষে থাকে সেই চিত্রের নামেই মানুষের রাশির পরিচয় নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

এবার ব্যাপারটা বুঝলে তো? মনে রেখো আকাশে তারায় তারায় আঁকা বারোটি চিত্রের নামেই বারোটি রাশি। ঐ রাশিগুলি আছে সূর্যের চলার পথে। তোমরা বড় হয়ে এই বিষয়ে পড়াশোনা করলে আরও অনেক কিছু জানতে পারবে।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই!

ভালো থাকো সকলে!

আদর আর ভালোবাসা নাও।

জয় হিন্দ।

তোমাদের দাদুমণি

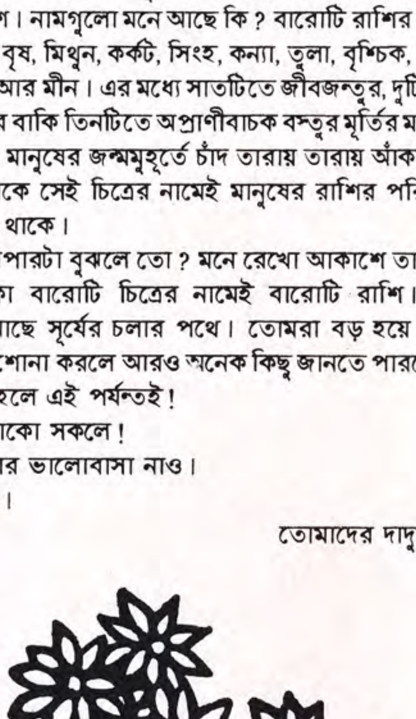

তোমাদের পাতা

শুভদীপ সামন্ত, বয়স নয় বৎসর
সাউথ সাইড প্রাইমারী স্কুল,
খড়গপুর

ঘুঘু পাখি

বাড়ির ছাদে বসে নিচের দিকে তাকিয়ে আছি। দেখি নিচে ঝোপের ঝাড়ে একটা লোক বসে কি জানি করছে। কিছুক্ষণ পর লোকটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। এই সময় একটা ঘুঘু পাখির ডাক শুনলাম। আমিও তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে জোরে জোরে ডাকতে লাগলাম। কিছুক্ষণ ডাকার পরে একটা ঘুঘু পাখি উড়ে এসে সামনের ঝোপটায় বসল। বসেই পাখিটা ছটফট করে উঠল, কিন্তু উড়তে পারল না। বুঝতে পারলাম পাখিটা ফাঁদে পড়েছে। লোকটা যে ওখানে জাল পেতে রেখেছে তা কে জানে।

দৌড়ে ছাদ থেকে নেমে এলাম পাখিটাকে ছাড়িয়ে দেব বলে। কিন্তু তার আগেই লোকটা পাখিটাকে ধরে জাল গুটিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

বিকেলে আমি মাঠের একটা বেঞ্চিতে বসে আছি এমন সময় দেখি সেই পাখি-ধরা লোকটা আসছে। সে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, ঘুঘু পাখি নেবে খোকাবাবু ? রান্না করে খাবে। মাত্র এক টাকায় দেব।

–না, সোজাসুজি জবাব দিলাম। তারপরই মনে হলো ও তো নিশ্চয়ই পাখিটাকে অন্য কারও কাছে বিক্রি করবে। আর তাহলে পাখিটা মরে যাবে। তাড়াতাড়ি লোকটার কাছে গিয়ে বললাম, দাও, আমি নেব।

পাখিটাকে হাতে পেয়েই মুঠো খুলে দিলাম, পাখি উড়ে পালাল। লোকটাকে বললাম, এই নাও তোমার টাকা।

দীপংকর ঘোষ, বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী,
পাহাড়হাটি গোলাপমণি বিদ্যালয়, পাহাড়হাটি, বর্ধমান

পাখির ছড়া

রমেশের ভাইরা
পুষেছিল পায়রা।
তাই দেখে অঞ্জন
নিয়ে এল খঞ্জন।
দু'জনের ঝগড়ায়
ঘরে টেঁকা হলো দায়।
তাই দেখে চিল হাসে
হাসে কাঠঠোকরায়।

নির্মাল্য বিশ্বাস
বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়
বরাহনগর, কলিকাতা

পার্থ নাগ, বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী, বারাসাত রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়, চব্বিশ পরগনা

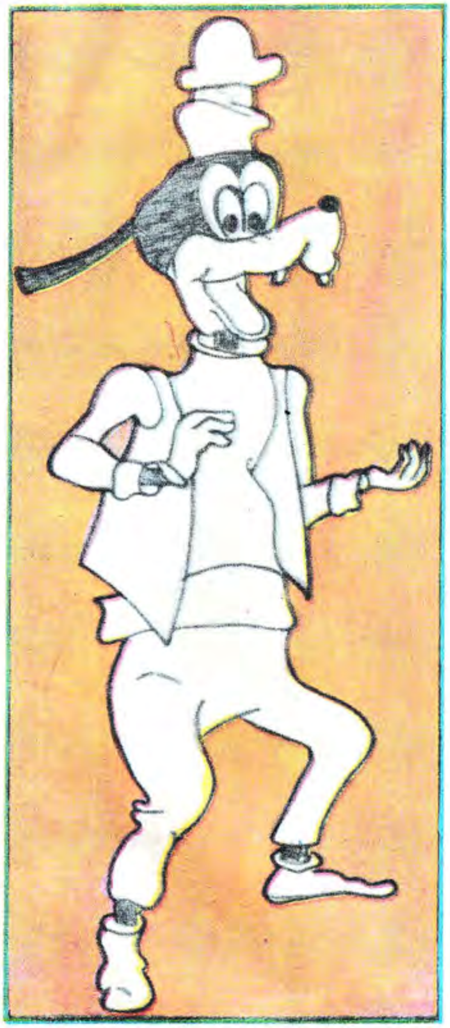

আশিস মুখার্জী, বয়স দশ, পঞ্চম শ্রেণী
সেন্ট আলফানসো স্কুল, কার্সিয়াং, দার্জিলিং

অরিত্র চ্যাটার্জী বয়স চার,
নর্টডেম একাডেমী, পাটনা

সোমনাথ দে, বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী
জয়দেব বয়েজ হাইস্কুল, দুর্গাপুর, বর্ধমান

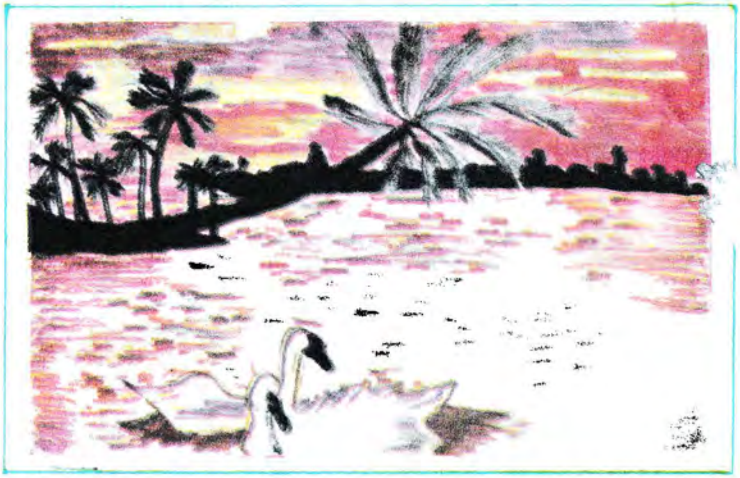

সৌরভ পাত্র, বয়স আট, চতুর্থ শ্রেণী, জগন্নাথকরবা প্রাইমারি স্কুল, মেদিনীপুর

অয়ন মন্ডল, বয়স ছয়, প্রথম শ্রেণী, বরাহনগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম বিদ্যালয়

হারাধন

নাম তার হারাধন, ডাক নাম হারু,
খেতে বড় ভালবাসে নারকেল নাড়ু।
বিজয়ার দিন তার চেনা-অচেনা নাই,
কাছে পিঠে বাড়ি পেলে ঢুকে পড়ে তাই।
ঢুকে পড়ে বলে, মাসী, পাটা দাও দেখি,
মাসীমা অবাক হন, আরে আরে একি!
ভেবে ভেবে সারা হন, এটা কোন ছেলে,
হেবো নয়, ভূতো নয়—ঠেকে গোলমেলে।
খাওয়া শেষ করে হারু বলে, আমি যাই,
হাঁফ ছেড়ে মাসী কন, তবে এস ভাই।

প্রসেনজিৎ গুপ্ত, বয়স পনেরো, দশম শ্রেণী
ইসলামপুর থানা কলোনী, পশ্চিম দিনাজপুর

মাসের নাম ফেব্রুয়ারি

আরতি বসু

যিশু খ্রীষ্টের জন্মের সাতশো বছর আগের কথা। রোমসম্রাট নুমা পম্পিলিয়াসের সভায় হাজির হয়েছেন রাজ্যের বড় বড় সব গণিতজ্ঞ আর জ্যোতির্বিদেরা। সম্রাটের জোর তলব। তাঁরা নিজেরা বলাবলি করছেন, সম্রাট নিশ্চয়ই আবার যুদ্ধযাত্রা করবেন, দিনক্ষণ গুনে দিতে হবে।

নুমা কিন্তু সভায় এসে কড়া গলায় কৈফিয়ত চাইলেন তাঁদের কাছে। বললেন, এভাবে কি কাজকর্ম চলে? মাসের সঙ্গে ঋতু মিলছে না। কখনও ফসল উঠবে সেপ্টেম্বরে, কখনো উঠবে অক্টোবরে! খাজনা তোলা, সৈন্যদের রসদ সংগ্রহ করা, বাণিজ্যযাত্রা–কোনো কিছুই নিয়মমাফিক করা যাবে না! ব্যাপার কী?

এর উত্তর পন্ডিতদের জানাই ছিল। তাঁরা বললেন, নতুন করে ক্যালেন্ডার তৈরি করতে হবে সম্রাট। গ্রীকদের ক্যালেন্ডারে বেশ কিছু ভুল আছে। ওরা বছর ধরেছিল ৩০৪ দিনে আর মাস ধরেছিল দশটি। বছরে আরও দুটো মাস বাড়াতে হবে নতুবা এক বছরের সবগুলো দিনের হিসেব মিলবে না।

নুমা তখন আদেশ দিলেন, তবে সে ভাবেই তৈরি করুন নতুন ক্যালেন্ডার।

তাই হলো, ডিসেম্বরের পর জোড়া হলো নতুন দুটি মাস জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি।

গল্প শেষ হতে না হতেই টুনু বলল, আচ্ছা ডিসেম্বরের পর? না মার্চের আগে? কোনটা ঠিক?

বললাম, ডিসেম্বরের পর বলাটাই বোধহয় ঠিক। কারণ গ্রীক ক্যালেন্ডারের মতো এই নতুন ক্যালেন্ডারেও বছরের প্রথম মাস ছিল মার্চ। সেই হিসাবে ফেব্রুয়ারি দ্বাদশ মাস। ফেব্রুয়ারি শব্দটা এসেছে 'ফেব্রুয়ারিয়াস' থেকে। যার অর্থ শুদ্ধীকরণ। নতুন বছরের আগে সব কিছু শুদ্ধ পবিত্র করার উদ্দেশে রোমানরা একটা উৎসব করতো এই মাসে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন ফেব্রুয়ারি এসেছে রোমান দেবতা 'ফেব্রুয়াস'-এর নাম থেকে। তিনি ছিলেন রোমানদের যমরাজ 'থেবস্'-এর সঙ্গী। সম্ভবত এই জন্যই এই মাসে রোমের কোথাও কোথাও মৃত আত্মীয়স্বজনদের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানো হতো।

তাহলে লিপ ইয়ার কবে থেকে শুরু? জানতে চাইল টুনু।

বললাম, সে অনেকদিন পর, ১৫৮২ সালে। এর মধ্যে খ্রীঃ পূঃ ৪৬ সালে জুলিয়াস সিজার আর একবার ক্যালেন্ডার সংশোধন করলেন–জানুয়ারি এল প্রথমে, ফেব্রুয়ারি থেকে দুটো দিন কেটে নিয়ে জোড়া হলো জুলাই-আগস্টে। বছর গোনা শুরু হলো ৩৬৫ দিনে। জুলিয়ান ক্যালেন্ডারেও কিন্তু কয়েক মিনিটের ভুল ছিল। সেই কয়েক মিনিটের ভুল জমতে লাগল দেড় হাজার বছর ধরে। ১৫৮২ সালে ইটালীর পন্ডিত গ্রেগরি ভুল শুধরে চালু করলেন লিপ ইয়ার গোনা। এর মধ্যে একটা জিনিস খেয়াল রেখো, প্রতি ৪ বছরে ফেব্রুয়ারিতে এক দিন বাড়লেও পূর্ণ শতবর্ষগুলি লিপ ইয়ার হবে না, যদি না তারা ৪০০ দিয়ে সম্পূর্ণ বিভাজ্য হয়।

টুনু এবার অবাক হয়ে বলল, এখনকার ক্যালেন্ডার তাহলে ইটালীতে তৈরি, ইংলন্ডে নয়?

ঠিক তাই। আর শুধু তাই নয়। এই ক্যালেন্ডারকে মানতে না চেয়ে ইংলন্ড ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিল। ১৭৫২ খ্রীঃ দেখা গেল ইউরোপের সব দেশ থেকেই ইংলন্ড ১১ দিন পিছিয়ে রয়েছে। সে এক হৈ হৈ কান্ড। তারপর থেকে সারা পৃথিবীতেই চলছে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার।

ছবিঃ রাহুল মজুমদার

বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

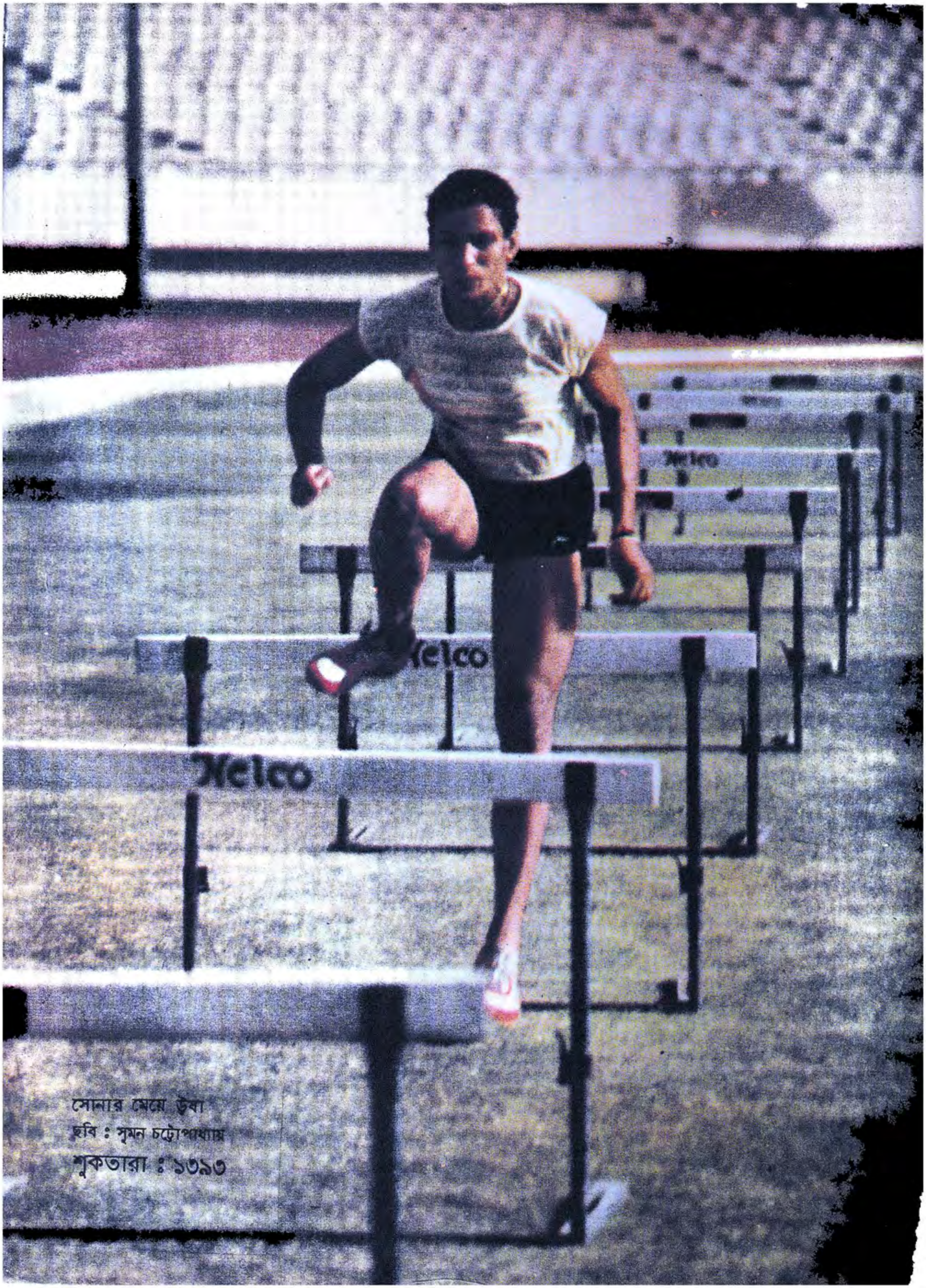

সোনার মেয়ে উষা
ছবি : সুমন চট্টোপাধ্যায়
শুকতারা : ১৩৯৩

Registration No. W.B./E.C.–60 January '87 "Suktara"

আপনার কেয়ো-কার্পিন চুল এই সুন্দর নতুন স্টাইলে বাঁধুন। চমৎকার দেখাবে!

কেয়ো-কার্পিনের এই স্টাইলে কী ভাবে চুল বাঁধবেন দেখুন !

একটি বড় সোনালী রঙের ফিতে নিন। একটি বড় সূঁচে পরান। মাথার সামনে থেকে চুল আঁচড়ে একগুছি চুল মাথার ঠিক উপরে শক্ত করে ধরুন। ফিতে দিয়ে গেরো বাঁধুন। দু'ধারে যেন সমান ফিতে ছাড়া থাকে।

গেরো থেকে এক ইঞ্চি দূরে আবার আধ ইঞ্চি মতন মোটা গুছি চুল নিন। সূঁচটি গুছির চারধারে গোল করে ঘুরিয়ে এনে ফিতের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে টানুন।

উপরোক্তভাবে মাথার দু'ধারে চুলের গুছি "সেলাই" হয়ে গেলে শেষ গুছির কাছে ফিতেটিতে ভালো করে দুটি গেরো বাঁধুন। এবার বাড়তি ফিতে কেটে ফেলুন।

ফিতের ডগা দুটি চুলের ভিতর গুঁজে ভালো করে পিন দিয়ে আটকে দিন।

CLARION C-DMHO-11

চুলের সর্বাঙ্গীন যত্নের জন্যে প্রতিদিন ব্যবহার করুন মৃদু সুরভিত কেয়ো-কার্পিন হেয়ার অয়েল।

চুলের পুষ্টি যোগাবে। চুল থাকবে সুন্দর, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এবং পরিপাটি। অথচ তেলমাখা চটচটে ভাব একেবারেই থাকবে না। এবার আপনি ইচ্ছেমতো যে কোন স্টাইলে চুল বাঁধুন।

১০০ মি.লি. ও ৩০০ মি.লি. শিশিতে পাওয়া যায়

কেয়ো-কার্পিন

সুগন্ধী হেয়ার অয়েল
চুল চটচটে করে না

সুস্থ চুল। সুন্দর চুল। কেয়ো-কার্পিন চুল।

Dey's®

যাদের যত্নই আপনার আস্থা